

সূচিপত্র

নাগরিক উদ্যোগ

ত্রৈমাসিক

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক প্রকাশনা

বর্ষ: ১৪, সংখ্যা: ২য়, এপ্রিল - জুন ২০২৫

সম্পাদক

জাকির হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

জাকির হোসেন

মোসাম্মৎ লাকী আক্তার

সুলতান মো: সালাউদ্দিন সিদ্দিক

বাসন্তি সাহা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

ফয়সাল এজাজ রিসান

আলোকচিত্র

নাগরিক উদ্যোগ

প্রকাশক

সম্পাদক কর্তৃক ৮/১৪, ব্লক-বি

লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।

মুদ্রণ

ডি. এস. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৩৪/ ডি,

নিউ এলিফ্যান্ট রোড

ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৫০ টাকা

যোগাযোগ

ফোন : ৪৮১২২৮২৯, ফ্যাক্স : ৪৮১২১৪৫৫

মোবাইল : ০১৭১৩১৩১৩৪৮,

০১৭১৩০৮১৮৫২

ই-মেইল : info@nuhr.org



স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের আসন্ন প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ পর্যাপ্ত প্রভাব মূল্যায়ন না করে এবং জনসাধারণসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের সাথে পরামর্শ ছাড়াই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য এক প্রকার তাড়াহুড়ো করছে বলে আমরা লক্ষ্য করছি। উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের চলমান প্রক্রিয়া ও তার ভবিষ্যত প্রভাবের পাশাপাশি এই অসম দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিণতি বয়ে আনবে। এর ফলে ভবিষ্যৎ সরকারগুলো দেশের স্বার্থে কোনো প্রগতিশীল সংস্কার গ্রহণ করতে গেলে নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে নানা ধরনের বাধা আসারও ঝুঁকি থেকে যাবে।

কেমন চলছে বরিশাল অঞ্চলে রাখাইনদের জীবন ও জীবিকা

১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সর্বপ্রথম খেপুপাড়ায় একজন কলোনিজেশন অফিসার নিযুক্ত করেন। তখন সমগ্র কলোনিজেশন এলাকার নাম ছিল “দি বাখরগঞ্জ-সুন্দরবন কলোনিজেশন”। এই কলোনিজেশন এলাকায় প্রায় ২৩৭টি রাখাইন গ্রাম গড়ে উঠেছিল। সেগুলোর প্রত্যেকটি ছিল নিজ হাতে জঙ্গল কেটে আবাদ করা জমির উপর। প্রথম জঙ্গল আবাদ করার পর বিনা খাজনায় পাঁচ থেকে দশ বছর চাষ করে ফসল ফলাতে পারত। পরবর্তীকালে সি এস সেটেলমেন্ট নামে “সার্কেল সেটেলমেন্ট”-এর মাধ্যমে প্রথম দশ বছরের জন্য খাজনা ধার্য করা হয়। এই সময়কালের মধ্যে অর্থাৎ ১৯০৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সময়টা কলোনিজেশন এর স্বর্ণযুগ বলা যায়।

যা আছে

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর এবং দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে: সেজন্য প্রয়োজন অত্যন্ত সতর্কতা	০৩
কেমন চলছে বরিশাল অঞ্চলে রাখাইনদের জীবন ও জীবিকা	০৮
আইনগত সহায়তা ও নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তি	১৪
দলিত নারীর এগিয়ে চলার গল্প	১৯
২০২৪ সালের শ্রম ও শিল্প পরিস্থিতি: একটি পর্যালোচনা	২১

সম্পাদকীয়

শ্রমজীবী, দরিদ্র, দলিত ও নিম্নবর্ণের মানুষের জীবন সংগ্রাম কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হয়। ফলে উচ্চবর্ণীয় ইতিহাসের নীচে নিম্নবর্ণীয় মানুষের ইতিহাস চাপা পড়ে যায়। সাধারণ, নিপীড়িত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের জন্য বিবেচনা করা হয়না। ফলে, এইসব দলিত ও নিম্নবর্ণের মানুষ দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর বঞ্চনার মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও এইসব মানুষের প্রবেশাধিকার থাকে না। দরিদ্র মানুষের পক্ষে কথা বলা, আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে এদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি অনেকটাই দুরূহ। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের বঞ্চনা এক্ষেত্রে অনেক বেশি। এদের সম্পদের মালিকানা নেই বললেই চলে। এসব প্রান্তিক মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক সালিশ একটি অন্যতম মাধ্যম। প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার বাইরে অপ্রাতিষ্ঠানিক বিরোধ মিমাংসার ব্যবস্থা আবহমানকাল থেকে গ্রামীণ সমাজে দরিদ্র মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য কাজ করে আসছে। এই অপ্রাতিষ্ঠানিক বিরোধ মিমাংসাকে আরো গ্রহণযোগ্য করা জরুরি।

বাংলাদেশে শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের যথাযথ মূল্য নিশ্চিত করার জন্য একক কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনও তৈরি হয়নি। গার্মেন্টস সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি বেঁধে দেয়া হলেও দেশের অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিম্নতম মজুরির ধারণা অবহেলিত। বিশেষ করে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ যে সকল খাতে কাজ করে সেগুলো শ্রমনির্ভর এবং অনিরাপদ। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নাই।

সমাজের দলিত, চা শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির উপায় খুঁজতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক নীতি কাঠামোর মধ্যে দিয়ে। কারণ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোই হচ্ছে নিয়ামক, দারিদ্র, বঞ্চনা অশিক্ষা থেকে বের করে আনার। রাষ্ট্র যদি এসব মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুস্থ পরিবেশ দিতে পারে, একটু ভালো জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে পারে তাহলে, এই জনগোষ্ঠী আর এক জায়গায় বিচ্ছিন্ন, আবদ্ধ থাকবে না। মুক্তির উপায় তারা নিজেরাই খুঁজে নেবে এবং সামাজিভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে তাদের উত্তরণ ঘটবে।

দলিত মানুষের পেশা, বিচ্ছিন্নতা ও জন্মগত পরিচয়ের কারণে হীনমন্যতাবোধ-এই ভাবনা থেকে বের হবার সময় এসে গেছে। দলিত সমাজের মেয়েরা শিক্ষায় ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজের নীতি নির্ধারক থেকে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সবারই ইতিবাচক সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। কারণ, এই সমাজে দলিত ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান তখনই নিশ্চিত হবে যখন একটি মানবিক, উদার ও মর্যাদাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।



স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর এবং দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে: সেজন্য প্রয়োজন অত্যন্ত সতর্কতা

বরকত উল্লাহ মারুফ

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের আসন্ন প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ পর্যাপ্ত প্রভাব মূল্যায়ন না করে এবং জনসাধারণসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের সাথে পরামর্শ ছাড়াই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য এক প্রকার তাড়াহুড়ো করছে বলে আমরা লক্ষ্য করছি। উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের চলমান প্রক্রিয়া ও তার ভবিষ্যত প্রভাবের পাশাপাশি এই অসম দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিণতি বয়ে আনবে। এর ফলে ভবিষ্যৎ সরকারগুলো দেশের স্বার্থে কোনো প্রগতিশীল সংস্কার গ্রহণ করতে গেলে নীতি

নির্ধারণী ক্ষেত্রে নানা ধরনের বাধা আসারও ঝুঁকি থেকে যাবে। আমরা আশা করি, দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অনিশ্চয়তাসমূহ বিবেচনা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অপ্রত্নত অবস্থায় গ্রাজুয়েশনের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্য বাণিজ্য অগ্রাধিকারের অকাল ক্ষতি এড়াতে একে বিলম্বিত করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবে। উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে না হতেই তাড়াহুড়ো করে অসম দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে প্রবেশ বিদ্যমান অনিশ্চয়তাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কাজেই, দেশের উন্নয়নের গতিপথ এবং নীতিগত ক্ষেত্র

সুরক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ, এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো বাংলাদেশের জনগণের জীবন ও জীবিকায় দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে এবং সময়ের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে।

গ্রাজুয়েশন হলে কী হতে পারে?

জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতি বিষয়ক কমিটি (সিডিপি) সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বাংলাদেশ ২৪ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর বা গ্রাজুয়েশন



একটি দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির একটি অর্থবহ স্বীকৃতি বটে, কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা হচ্ছে, এটি ঘটছে দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার সময়ে। এই রূপান্তরের ফলে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যে অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা ভোগ করছে তার অনেকটাই হারাবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও মূলত বস্ত্র ও পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানির উপর নির্ভরশীল। এই শিল্প ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এই কর্মসংস্থানের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির অভাব, শ্রমিক অসন্তোষসহ নানা ধরনের ঝুঁকি রয়েছে, যার কারণে দেশের জীবনীশক্তিস্বরূপ এই খাতটি এখনও স্থিতিশীল নয়। এই অবস্থায় বিশেষ করে এই খাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুবিধা প্রত্যাহার হবে আত্মঘাতী।

বাংলাদেশে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী রয়েছে। যার অধিকাংশ ব্যাপক দারিদ্র্য ও বৈষম্যের শিকার, খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ও পরিষেবায় তাদের প্রবেশাধিকার অন্ত্যস্ত সীমিত, যা মানব উন্নয়নে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। বাংলাদেশ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে অগ্রগতি অর্জন করলেও মানব উন্নয়ন এবং অন্যান্য উন্নয়ন সূচকে এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

সিডিপির পর্যবেক্ষণে যখন (২০২১ সালে) বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নীত হবার জন্য প্রস্তুত বলা হয়েছে, তার পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন অনেক পরিবর্তনের ডেউ এসেছে যা একটি দেশের সুষ্ঠু ও টেকসই উন্নয়নের যাত্রাকে টালমাটাল করে দিতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে, কোভিড-১৯ মহামারীর ধাক্কায় সংঘটিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি; ২০২২ সালের আন্তর্জাতিক খাদ্য সংকট; সম্প্রতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, যা গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য আশাব্যঞ্জক হলেও এর ফলে নতুন করে দারিদ্র্য বৃদ্ধিসহ বহু ধরনের অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষতি ও চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে; এবং সর্বোপরি, বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের চাপিয়ে দেয়া এক বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধ, যা বাংলাদেশের বাণিজ্যকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। দ্য ইকোনমিস্ট পত্রিকা উল্লেখ করেছে, ২০২৫ সালের এপ্রিলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ঘোষিত বাংলাদেশের উপর আরোপিত ৩৭% অতিরিক্ত শুল্কসহ অন্যান্য দেশের উপর নানা মাত্রার শুল্ক আরোপ-৯০ দিনের সাময়িক বিরতি সত্ত্বেও বিশ্ব বাণিজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী নীতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সম্প্রতি, এটি ২০%-এ নামিয়ে আনার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে আমরা আরও দেখতে পেয়েছি, গত ১৫ বছরে ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বার্ষিক ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) সমপরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে। এসব ঘটনার প্রত্যেকটি বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে বড় ধরনের অভিঘাত সৃষ্টি করেছে যা এই সময়ে গ্রাজুয়েশন বিষয়ে পুনর্বিবচনার দাবি রাখে।

বাংলাদেশ প্রথম ২০১৮ সালে গ্রাজুয়েশনের মানদণ্ড পূরণ করে এবং সিডিপি অনুসারে এই অর্জন কমপক্ষে তিন বছর ধরে চলমান থাকলে তবে গ্রাজুয়েশন চূড়ান্ত হবে। সে অনুযায়ী ২০২১ সালে সিডিপির ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বলা হয়, বাংলাদেশ সেই পর্যালোচনায়ও উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে, তার পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের জনশুমারি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়। বিশেষজ্ঞরা তখন বলেন, মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে দেখানোর জন্য জনসংখ্যা হ্রাস করে দেখায় তৎকালীন সরকার। নিজেদের সময়ে সেই সরকার উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও অস্বাভাবিক অগ্রগতি দেখাতে তথ্য জালিয়াতি করে বলে অভিযোগ ওঠে।

এই পরিস্থিতি বিবেচনা করলে গুরুত্বপূর্ণ

প্রশ্ন দেখা দেয়, বাংলাদেশ কি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্ত অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা হারানোর ক্ষতি মোকাবেলা করতে পারবে? বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) আওতায় কৃষি, শিল্পপণ্য এবং পরিষেবা বিষয়ক বিভিন্ন চুক্তির অধীনে প্রদত্ত অনুকূল সুবিধা হারাতে বাংলাদেশ, যা দেশের জীবিকা এবং ভবিষ্যতের উৎপাদন সম্ভাবনা উভয়কেই হুমকির মুখে ফেলবে। বিশেষ করে, এর ফলে বেশ কয়েকটি উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার হারাতে বাংলাদেশ। যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানি বাজার (দেশের রপ্তানির ৪৮% ইইউতে যায়) এবং স্বল্পোন্নত দেশ হবার সুবিধা হিসেবে আমাদের প্রায় ৯৩% রপ্তানি সেখানে বিনা শুল্কে প্রবেশ করে। গ্রাজুয়েশনের পর এই শুল্ক হবে সদ্য উন্নয়নশীল দেশের সুবিধা অনুযায়ী ৯.৬% অথবা আমদানীকারক দেশের নীতি অনুযায়ী সাধারণ শুল্ক হার ১২% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে (রূপান্তরকালীন স্থায়ীত্বশীলতার জন্য তিন বছরের গ্রেস পিরিয়ড যখন শেষ হয়ে যাবে)। একইভাবে, গ্রাজুয়েশনের পর কানাডায় বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির উপর শুরু আরোপ হবে ১৬-১৮%, যেখানে এখন স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য শুল্কহার ০%। জাপানে বাংলাদেশের পোশাকের উপর শুল্ক এলডিসি হিসেবে ০% থেকে বেড়ে ৭.৪ থেকে ১২.৮% পর্যন্ত হতে পারে। ২০১৬ সালে জাতিসংঘ হিসাব করে, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি কেবল জি-২০ দেশগুলোতে প্রায় ৭% হ্রাস পাবে এবং ২০১৮ সালের একটি বিশ্লেষণে অনুমান করা হয়, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের কারণে ইইউ, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ৯.৮% হ্রাস পাবে এবং ২০১৮ সালের আরেকটি গবেষণায় দেখানো হয়, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি ৮.৭% হ্রাস পাবে।

মেধাস্বত্ব সম্পত্তির (আইপি) ক্ষেত্রে, গ্রাজুয়েশনের পর, বাংলাদেশকে TRIPS

চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাপী ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশনগুলোকে ওষুধ পণ্যের পেটেন্ট আদায় করার অনুমতি দেওয়া, যা দেশীয় জেনেরিক উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত করবে এবং বাংলাদেশে পেটেন্টের একচেটিয়া অধিকার প্রদানের ফলে ওষুধের দামবৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ এবং এলডিসি গ্রুপ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ১২ বছরের ট্রানজিশন পিরিয়ডের (বর্তমানে এটি মাত্র ৩ বছর) জন্য লড়াই করে আসছে, তবে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিরোধও রয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা FTA অভিমুখে যাত্রা

সরকারি ভাষ্যমতে, আসন্ন গ্রাজুয়েশনের ফলে গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলোর সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সম্প্রতি জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অনেকগুলো দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা এফটিএ সম্পাদন করছে, এর মধ্যে আমেরিকার সাথে চুক্তির প্রক্রিয়া চলছে এপ্রিল ২০২৫ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত শুল্ক কমানোর জন্য। ইতিমধ্যে আমেরিকার সাথে একটা দেনদরবারের পর ৩৭% থেকে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি শুল্ক ২০% করা হলেও, নন ডিসক্রোজার বাধ্যবাধকতার কারণে আমরা জানি না, এর বিনিময়ে বাংলাদেশকে কী কী ছাড় দিতে হবে। বলা হচ্ছে, এই এফটিএগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ সেসব দেশে তার টেক্সটাইল এবং তৈরি পোশাক খাতের বাজার (যা কি না দেশের রপ্তানির ৮৪.৫৮ শতাংশ) রক্ষার চেষ্টা করছে। এই চেষ্টায় বেশ তাড়াহুড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা বজায় রাখার জন্য সবচেয়ে উত্তম পছন্দ হবে এই গ্রাজুয়েশন বিলম্বিত করা। কারণ এফটিএতে অনেক বাধ্যবাধকতা রয়েছে যা বাংলাদেশের জন্য শেষ বিচারে ক্ষতিকরই হবে। এর কিছু ব্যাখ্যা নিচে দেয়া হলো।

ইতিমধ্যে এ ধরনের এফটিএ সম্পন্ন করা

বাংলাদেশের সমপর্যায়ের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের মতো দেশের সাথে চুক্তি করতে গেলে তাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা অনুযায়ী বাংলাদেশকে কৃষি ও মৎস্যসহ দেশের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক ছাড় দিতে হবে। বাংলাদেশের কৃষি ও শিল্প খাতের সুরক্ষার জন্য এ সংক্রান্ত পণ্য আমদানিতে আরোপিত শুল্ক যথাক্রমে ১৭.৭ এবং ১৩.৫ শতাংশ, যা এসব চুক্তির অংশীদার দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। কাজেই বাংলাদেশকে প্রথমেই এসব আমদানি শুল্ক তাদের তুলনায় অনেক বেশি কমাতে হবে এবং দেশের বাজার উন্মুক্ত করে দিতে হবে। মৎস্য খাতে, বাংলাদেশের গড় আমদানি শুল্ক হার ২৩.৭ শতাংশ। সেটিও অনেক কমাতে হবে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী। এর ফলে বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যাপক প্রভাব পড়বে, যার বিকল্প এখনও চিন্তা করা হয়নি।

মজার ব্যাপার হলো, আমাদের বাজার ও অংশীদার দেশের বাজারে তুলনামূলক পারস্পরিক লাভ গুণতে গেলে কোনো কিনারা পাওয়া যাবে না। কারণ, এই দেশগুলোতে আমদানি শুল্ক অনেক কম হলেও নানাভাবে দেয়া উচ্চমাত্রার ভর্তুকি এবং পণ্য আমদানিতে বিভিন্ন অশুল্ক-জনিত বাধা, যেমন মানদণ্ডের কঠিন পরীক্ষা ইত্যাদি দিয়ে শুল্ক ছাড়ের ঘাটতি তারা পুষিয়ে নেয়। এদিকে, অংশীদার দেশগুলোর জন্য রীতিমতো হুমকি হয়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক উচ্চ হারের শুল্ক নাও কমানো হতে পারে। এই ধরনের এফটিএ-র অধীনে বাজার উদারীকরণের বাধ্যবাধকতা বাংলাদেশের রাজস্ব, কৃষি ও মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের উপর গভীর প্রভাব ফেলবে, দেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র চাষীদের জীবন ও জীবিকা পাল্টে যাবে। এমনকি জেনেরিক ওষুধ খাতের মতো অন্যান্য শিল্পেও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এছাড়াও, এসব চুক্তির বলে বাংলাদেশকে এমন কিছু মূল নীতিগত ক্ষেত্রে গভীর ছাড় দিতে হতে পারে, যা কেবল উৎপাদন এবং



কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকেই সীমিত করবে না বরং টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকারের নীতি প্রণয়নের ক্ষমতাকেও খর্ব করবে।

এরকম একটি ক্ষেত্র হলো, আইপি বিষয়ক ছাড় (আইপি চ্যাপ্টার কনসেশন), যার প্রভাব পড়বে মানুষের সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ কেনার সামর্থ্যে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে। যদিও বাংলাদেশ কেবল উন্নয়নশীল দেশ হবার পর ট্রিপস চুক্তি বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সম্ভবত আরব আমিরাতে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো এফটিএ অংশীদারদের চাপে আইপিতে তার চেয়েও কঠিন শর্ত বাংলাদেশকে গ্রহণ করতে হতে পারে। এর মধ্যে ডেটা এক্সক্লুসিভিটির মতো বিধান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যা কোনো ওষুধের বিপণন অনুমোদনের সময় ট্রায়াল ডেটা ব্যবহার করতে বাধা দেয়, এমনকি যদি সেই ওষুধের কোনো পেটেন্ট নাও থাকে। ফলে, এটি ব্যবহার করে জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনে বিলম্ব করতে বাধ্য হতে হয়। এফটিএর বলে এই দেশগুলি বাংলাদেশকে ট্রিপস অনুমোদিত ২০ বছর মেয়াদি পেটেন্ট সময়সীমা পার হবার পরেও সেই পেটেন্ট মনোপলি মেনে চলতে বাধ্য করতে পারবে, এবং সাধারণ আইনের বাইরে গিয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বলে দেশীয় আইন বদলে পেটেন্ট প্রয়োগকে শক্তিশালী করতে বাধ্য

করতে পারে। যার ফলে অনেক সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক ওষুধের উৎপাদন এবং প্রাপ্যতা এবং এর জেনেরিক ঔষধ শিল্প হুমকির মুখে পড়তে পারে।

উন্নত দেশগুলির সাথে এফটিএ চুক্তিতে প্রায়শই বিনিয়োগকারী রাষ্ট্র বিরোধ নিষ্পত্তি (ইনভেস্টর স্টেট ডিসপুট সেটেলমেন্ট বা আইএসডিএস)-এর বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত থাকে যার অনুবলে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি আন্তর্জাতিক সালিশি ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে, যদি তারা মনে করে, তাদের বিনিয়োগ রাষ্ট্রের কোনো পদক্ষেপের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সালিশি মামলায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর পাশাপাশি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিরুদ্ধেও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আইএসডিএসের মাধ্যমে বিলিয়ন ডলারের মামলা করেছে। এসব মামলা চালাতে গিয়ে বা ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে স্বল্পোন্নত দেশগুলো তাদের জরুরি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ মূল্যবান রাজস্ব ব্যয় করতে বাধ্য তো হয়েছেই, উপরন্তু, এসব মামলার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, জনস্বাস্থ্য, জীবিকা রক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, কর নীতি বাস্তবায়ন, শ্রম অধিকার উন্নয়ন ইত্যাদি জনসম্পৃক্ত নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতাও খর্ব হয়েছে। সরকারকে জনগণের জন্য নয়, বরং

বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ অনুযায়ী নীতি প্রণয়ন করতে হচ্ছে। এমন ১৮টি বহুল পরিচিত আইএসডিএস মামলা রয়েছে, যার প্রতিটিতে বিদেশি বিনিয়োগকারী ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি জিতে নিয়েছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই অতীতে এমন একটি আইএসডিএস মামলা হেরেছে; আসন্ন এফটিএগুলোতে এই ধরনের বিধান বাংলাদেশকে আবারও এই ধরনের বিরোধের ঝুঁকিতে ফেলবে।

বাংলাদেশ যেসব এফটিএ নিয়ে এখন অগ্রসর হচ্ছে, সেগুলোতে আরেকটি বড় ধরনের আপোস সাধারণত করতেই হয়, যার প্রভাব অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে বাংলাদেশের জন্য, তা হলো ডিজিটাল খাত উদারীকরণের চাপ। এই বিধান কেবল ডিজিটাল পণ্য ও পরিষেবার ই-ট্রান্সমিশনের উপর বাংলাদেশের প্রাপ্য সম্ভাব্য রাজস্বই সীমিত করবে না, বরং জাতীয়ভাবে উপকারী ডিজিটাল শিল্পায়নের পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্প উদ্ভাবনকে সীমিত করবে এবং অনেক ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে খর্ব করবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটি বাংলাদেশের মূল্যবান তথ্য ভান্ডার, যা আজকাল বিশ্বব্যাপী নব্য তেল সম্পদ নামে পরিচিত, বিদেশি ডিজিটাল কর্পোরেশনের কাছে সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তরের পথ করে দিতে পারে। বিদেশী ই-কমার্স কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে কাজ করছে, কিন্তু এফটিএর মাধ্যমে তাদের গভীর নীতিগত হস্তক্ষেপের ব্যাপারে একমত হলে, জাতীয় স্টার্টআপ সহ বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিশীল ডিজিটাল শিল্পের ভবিষ্যৎ স্থায়ীভাবে ঝুঁকির মুখে পড়বে।

এই এফটিএ দ্বারা আরেকটি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেটা হলো সরকারি ক্রয়, যা বাংলাদেশের জিডিপি একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এফটিএ-র একেবারে সাধারণ শর্ত অনুযায়ী এ খাত বিদেশি কোম্পানির জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এর ফলে, দেশীয় শিল্প, কৃষক, স্থানীয় সরবরাহকারী এবং বিশেষ করে দুর্বল ক্ষেত্রগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া থেকে বিরত থাকতে

বাধ্য হবে সরকার। এই উন্মুক্তকরণ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে সমস্যাযুক্ত হয়ে উঠেছে। স্থানীয় উঠতি কোম্পানিগুলোকে তখন বড় বড় আন্তর্জাতিক এবং উচ্চমাত্রার সরকারি ভর্তুকিপ্ৰাপ্ত কোম্পানির সাথে অসম প্রতিযোগিতায় নামতে হবে, যাদের ক্ষমতা এবং সম্পদ এদের তুলনায় অনেক বেশি। তার উপর, এফটিএ-র শর্তবলে, ক্রয় আদেশ প্রাপ্ত হবার পর বিদেশি কোম্পানি যেসব পণ্য আমদানি করবে, সেগুলোর উপর থেকে সরকার শুল্ক প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে, যেখানে দেশি কোম্পানি আমদানি শুল্ক থেকে রেয়াত পায় না, ভর্তুকি পাওয়া তো দূরের কথা।

পরিশেষে, সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা- উভয় প্রক্রিয়াই গোপন, অগণতান্ত্রিক এবং অনংশগ্রহণমূলক। উভয় বিষয়ে বর্তমানে কী হচ্ছে, কারা আলোচনা করছে, কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে- এসব বিষয়ে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষ করে, এফটিএতে প্রথমেই নন-ডিসক্লোজার নামে একটি শর্ত থাকে, যার কারণে সরকার গণমাধ্যমে বা অন্য কোথাও সে বিষয়ে এমনকি ভুক্তভোগীদের জন্যও কোনো তথ্য প্রকাশ না করতে বাধ্য থাকে। ইতিমধ্যে, সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের এ কথা বলতে শোনা গেছে, যে নন-ডিসক্লোজারের শর্ত রয়েছে বলে তারা কিছু জানাতে অপারগ।

বাংলাদেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন সম্ভাবনা এবং এর জনগণের উপর এর বিশাল প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ থেকে নাগরিক সমাজ সংগঠন, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের বাদ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের করণীয় ও দাবি

এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে, উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা নাগরিক সমাজ সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে সরকারকে দুটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।



উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ বা গ্রাজুয়েশন প্রসঙ্গে:

১. বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্পষ্টতই বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য অনুকূল নয় বলে এই উত্তরণের প্রক্রিয়া যথাসম্ভব বিলম্বিত করা উচিত।
২. ভবিষ্যতে উত্তরণ-পরবর্তী সম্ভাব্য প্রভাবগুলির একটি বিস্তৃত, স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মূল্যায়ন পরিচালনা করার জন্য সময় নেয়া উচিত এবং এসব কাজের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।
৩. ভবিষ্যতে সম্ভাব্য উত্তরণের পরে এই প্রভাবসমূহ মোকাবেলা করতে বাংলাদেশকে একটি জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে হবে। পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে স্বল্পোন্নত দেশগুলির উত্তরণ বিলম্বিত করার একাধিক উদাহরণ রয়েছে। এটা লজ্জিত হবার বা মান সম্মান চলে যাবার কোনো বিষয় নেই।

দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এফটিএ প্রসঙ্গে:

১. জনস্বার্থ বিবেচনায় বাংলাদেশের উচিত অবিলম্বে বিভিন্ন এফটিএ আলোচনা বন্ধ করা। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা যতদূর অগ্রসর হয়েছে, তার বিস্তারিত জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে, বিশেষ করে কী কী শর্ত বাংলাদেশের উপর আরোপিত হবে, সেগুলো।

২. স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালনার পরেই এই ধরনের যেকোনো আলোচনা শুরু হওয়া উচিত।

৩. এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কৃষক, জেলে, শিল্প সংস্থা, চিকিৎসার্থী গোষ্ঠী, শ্রমিক, শিক্ষাবিদ এবং নাগরিক সমাজ সংগঠন সহ বিস্তৃত স্টেকহোল্ডারদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আমরা আশা করি, দেশের এই সংকটকালীন সময়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে অন্তর্বর্তীকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশের স্থিতিশীলতা ও অগ্রযাত্রার নিশ্চয়তা বজায় রাখবেন এবং তাদের প্রতিশ্রুত প্রগতিশীল সংস্কার এজেন্ডা অনুসরণে নীতিগত অবস্থান ধরে রাখার বিষয়ে শক্তি এবং সাহস প্রদর্শন করবেন, যার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ সরকারগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ অগ্রসর হবে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে অকালে অপরিপক্ক অবস্থায় উত্তরণ ঘটিয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অগ্রাধিকার হারিয়ে ফেললে অথবা তাড়াহুড়া করে এফটিএগুলোতে স্বাক্ষর করে ফেললে সেগুলোর শর্তসমূহ এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বা ভবিষ্যতের সরকারগুলোর নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা এমনভাবে সীমিত করবে যে বাংলাদেশের পক্ষে এই অগ্রযাত্রা আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

বরকত উল্লাহ মারুফ
গবেষক, নাগরিক উদ্যোগ
bmaruf@gmail.com



কেমন চলছে বরিশাল অঞ্চলে রাখাইনদের জীবন ও জীবিকা ?

মেইনথিন প্রমীলা

বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে সর্ব দক্ষিণে রয়েছে রাখাইনদের বসতি। “রাখাইন” শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে “রক্ষা” শব্দ থেকে যার অর্থ হলো যে জনগোষ্ঠী নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও টিকিয়ে রাখায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাখাইন জনগোষ্ঠী। তবে রাখাইনদের প্রশ্ন রাষ্ট্র কেন তাদের রক্ষায় অমনোযোগী? রাষ্ট্রের কাঠামোয় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে প্রচণ্ডভাবে প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠী আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন তাদের অস্তিত্ব ভয়াবহ সঙ্কটাপূর্ণ। জালিয়াতির মাধ্যমে জমি জবরদখল, রাজনৈতিক প্রভাবশালী ও স্বার্থান্বেষী দালাল চক্রের দৌড়াওয়া এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তার কারণে তারা তাদের ভূমি হারাচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তার সমস্ত সত্তা ও শরীর নিয়ে রাখাইনরা এ দেশে বিন্যস্ত। আপন জাতিগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে তারা বাংলার মাটিতে নতুন ভূমি

চেতনায় ভাগ্যকূল মেনে সাজিয়ে তোলে জীবন-সংসার-সমাজ ১৭৮৪ সাল থেকে। বাংলাদেশ একটি বহুজাতির বহু ভাষার বহু সংস্কৃতির বৈচিত্র্য পূর্ণ দেশ। এ দেশে বৃহত্তর বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী ছাড়া ও প্রায় ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার ৪৫টির ও অধিক আদিবাসী স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। মোট জনসংখ্যা কোথাও বলা হয় ১২ লাখ, কোথাও ১৮ লাখ, কোথাও বা বলা হয় ৩০ লাখ, কোথাও দেখানো হয় জাতিসংখ্যা ২৪, ২৫, ২৭ আবার কোথাও দেখানো হয় ৪৫ বা তার ও কম বেশি। রাষ্ট্র এখনও সঠিক পরিসংখ্যান দিতে পারে নি। ভৌগলিক ভিন্নতায় দেশের সবগুলো অঞ্চলই বৈচিত্র্য ও বৈভবে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের। এক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকলেও আদিবাসীদের জীবনের মূল অবলম্বন ভূমি হারানোর বেদনা সব অঞ্চলেই এক। আদিবাসীরা প্রকৃতিকে অনুভব করতে পারে, তারা বন ও সম্পদকে কোনোদিন বেচাকেনার বিষয় হিসেবে দেখে না, জীবনের অংশ হিসেবে দেখে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা বন, সম্পদ, প্রকৃতি সবকিছু ভোগ ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে দেখে।

আজকে আমরা দেশের সর্বদক্ষিণ উপকূল অঞ্চলে বসবাসরত রাখাইন জনগোষ্ঠীর নানা সমস্যার মাঝে ভূমি সমস্যার কথাই তুলে ধরব।

ইতিহাস

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রাখাইনরা বরিশালের সর্ব দক্ষিণাঞ্চল উপকূলীয় এলাকায় পদার্পণের পূর্বে এলাকাটি জনমানবহীন হিংস্র স্থাপদসংকুল গভীর বনভূমি ছিল। তদানিন ব্রিটিশ সরকারের আনুকূলে এই অঞ্চলকে তারা চাষযোগ্য আবাদভূমিতে রূপান্তর করে। যার দ্বারা যতটুকু ভূমি দখলে আসে সরকারিভাবে তা দখলীয় সত্তে মালিকানা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার ও জি ই হার্ভের সমসাময়িক তথ্যেও পরিদৃষ্ট হয় ১৮ শতকের শেষপ্রান্তে ব্রিটিশ সরকার জঙ্গল পরিস্কার ও ভূমি পুনরুদ্ধারকল্পে রাখাইনদের সুন্দরবন অঞ্চলে পুনর্বাসিত করে। বর্তমান পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার গলাচিপা, কলাপাড়া, আমতলী ও বরগুনায় এভাবে ধীরে ধীরে জঙ্গলাকীর্ণ উপকূলীয় পলিসঞ্চিত ভূমিতে

রাখাইনরা বসতি বিস্তার করে। রাখাইনদের দিয়ে বন-জঙ্গল পরিষ্কার ও পতিতজমি আবাদে উৎসাহিত করার জন্যে ব্রিটিশ সরকার ভূমি আবাদকারীর প্রথাগত অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সর্বপ্রথম খেপুপাড়ায় একজন কলোনিজেশন অফিসার নিযুক্ত করেন। তখন সমগ্র কলোনিজেশন এলাকার নাম ছিল “দি বাথরগঞ্জ-সুন্দরবন কলোনিজেশন।” ঐ কলোনিজেশন এলাকায় প্রায় ২৩৭টি রাখাইন গ্রাম গড়ে উঠেছিল। সেগুলোর প্রত্যেকটি ছিল নিজ হাতে জঙ্গল কেটে আবাদ করা জমির উপর। প্রথম জঙ্গল আবাদ করার পর বিনা খাজনায় পাঁচ থেকে দশ বছর চাষ করে ফসল ফলাতে পারত। পরবর্তীকালে সি এস সেটেলমেন্ট নামে “সার্কেল সেটেলমেন্ট”-এর মাধ্যমে প্রথম দশ বছরের জন্য খাজনা ধার্য করা হয়। ঐ সময় কালের মধ্যে অর্থাৎ ১৯০৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সময়টা কলোনিজেশন এর স্বর্ণযুগ বলা যায়। কারণ ঐ সময়ে রাখাইন জনগোষ্ঠীর প্রধানগণ এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অনেক ঐতিহ্যময় বৌদ্ধ স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলকে একটি সমৃদ্ধ সম্পন্ন রাখাইন এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৪৫-১৯৫০ সাল পর্যন্ত পরিচালিত সার্ভে ও সেন্টেলমেন্ট অপারেশনে এ অঞ্চলে ৮৫% রায়তদের (Tenure holder) অধীন এবং জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে আবাদকারীরা (Tenure holder) অধিক বিদ্যমান ছিল। ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে পটুয়াখালীর রাখাইনদের বাথরগঞ্জের “মগ” অভিধায় আদিবাসীরূপে স্বীকার করে ভূমির হস্তান্তর বিষয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে উক্ত আইনের ৯৭ ধারা সন্নিবেশ করা হয়।

বর্তমান পরিস্থিতি

রাখাইন জনগোষ্ঠী ভূমিজনিত নানা সমস্যায় জর্জরিত। নিজের জমির রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও প্রভাবশালী ভূমিগ্রাসী চক্র ক্রমাগতভাবে রাখাইনদের জমিজমা কেড়ে নিচ্ছে জোড় করে। দখল থেকে

বাদ যায়নি দেবালয়-শ্মশান ভূমিও। জাল দলিল দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে, নানারকম মামলা দিয়ে সর্বশান্ত করা হচ্ছে। এভাবে জমির মালিকানা থেকে দিন দিন রাখাইনদের নাম মুছে দেয়া হচ্ছে। বিকৃত করে দেয়া হচ্ছে পাড়া/গ্রামের নামকরণ। ফলে রাখাইন জনসংখ্যা ৯৫ ভাগ কমেছে এই অঞ্চল থেকে। অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এ অঞ্চলের আদিবাসীরা পিছিয়ে থাকায় তুলনামূলক ভাবে গণমাধ্যমেও এই চিত্র কম।

বিভিন্ন নথি অনুযায়ী দেশের উপকূলে বসবাসরত ৯৯ ভাগ রাখাইন পরিবারই আজ ভূমিহীন। এই ভূমিহীনতার কাহিনী করুণ এবং প্রশ্নহীন। অথচ একটু পিছনে তাকালে দেখি, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে আদিবাসীদের মধ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল শতকরা ২০-২৫ ভাগ, বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৯০ ভাগে। রাখাইনদের জমি শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি হয়ে গেছে। রাখাইনরা কখনও কখনও আইনের আশ্রয় নিয়েছে, মামলা করেছে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মামলা চালাতে গিয়ে একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেছে। সময়ের পরিবর্তন, কিছু বাঙ্গালী কর্তৃক জমি দখল, আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকা, ধর্মীয় ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক কাজে বাঁধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বরগুনা- পটুয়াখালীর রাখাইন জাতিসত্তা।

পায়রা বন্দরের জন্য অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত রাখাইন পরিবার

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ছয়আনিপাড়ার ৬ টি রাখাইন পরিবারকে নাগরিক প্রতিনিধিবৃন্দের প্রতিবাদ আর দাবি জানানোর পরে অবকাঠামো বাবদ কিছু ক্ষতিপূরণ দিলেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ও সুরাহা না করেই তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয় নভেম্বর ২০২১। পায়রা তৃতীয় সমুদ্রবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণের আওতায় পড়ায় প্রায় তিনশ বছরের প্রাচীন আদিবাসী রাখাইনপল্লী আজ নিশ্চিহ্ন। অভিযোগ আছে যে, বন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণের সময় পাড়াটিকে বাদ দেয়ার

দাবি জানিয়ে আসলেও কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি তেয়াফা না করে কয়েক মাস আগে থেকে বারংবার নোটিশ দিয়ে আসছিল। এর আগে বাড়িঘরসহ বিদ্যমান অবকাঠামোর বিপরীতে ক্ষতিপূরণ ও যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য দাবি জানানো হলেও সেটির সুরাহা না করেই প্রতিদিন যন্ত্রপাতি নিয়ে একটু একটু করে গ্রামের বিভিন্ন জায়গা ভাঙ্গা হয়। যদিও স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ এর ধারা (১৩) অনুসারে “ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান ও শ্মশান অধিগ্রহণ করা যাবে না।” কিন্তু ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থার আগেই গত ১০ জুন রাতের আঁধারেই পায়রাবন্দর কর্তৃপক্ষ রাখাইন পাড়ার প্রবেশ পথ কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রথা অনুযায়ী প্রতি রাখাইন গ্রামে দুটি শস্যানভূমি থাকে। যার মধ্যে শতবছরের পুরাতন শস্যানভূমি পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কোন রকম অনুমতি ও আলোচনা ছাড়াই বালু দিয়ে ভরাট করে ফেলে। অন্য শস্যান ভূমির উপর রাস্তা নির্মাণ শুরু করে দেয়। বালু ফেলে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে তাদের সংরক্ষিত সুপেয় পানির পুকুর। মানা হয়নি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন।

স্থানীয় ভুক্তভোগী চিংদামো রাখাইনের বক্তব্যমতে, বন্দর কর্তৃপক্ষ ছয়আনী পাড়াবাসীকে বন্দরের জন্য নির্মিত গুচ্ছগ্রামে স্থানান্তরিত করতে চাইছে। সেই গুচ্ছগ্রামে থাকতে হবে অ-আদিবাসীদের সাথে, যেখানে আদিবাসীরা থাকতে চাইছেন না। কেননা, আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র জীবনধারা অনুযায়ী বসবাস করেন। শত বছরের পুরনো ঐতিহ্য, বটগাছ, বৌদ্ধ মন্দির এবং সাংস্কৃতিক নানা উপাদান ছেড়ে বাঙালি অধ্যুষিত সেই গুচ্ছগ্রামে থাকতে চান না। কিন্তু প্রশাসনকে তারা এটা জানালেও প্রশাসন নির্বিকার। তাদের সংস্কৃতি ও জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এমন জায়গায় পুনর্বাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। পুনর্বাসনে মৃতদেহ সৎকারের জায়গা এবং বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জায়গা ও অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পায়রা বন্দরে তাদের চাকুরির ব্যবস্থা করতে হবে।

রাখাইন জনসংখ্যা

যদি অতীতের পরিসংখ্যান আমরা দেখি; ১৭৮৪-১৯০০ সালের দিকে বরিশাল উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ১,০০,০০০ রাখাইন বসবাস করত। ১৯০০-১৯৪৮ সালে এই সংখ্যা হয় ৩৫,০০০-৫০,০০০। ১৯৯০সালে ৪০০০ জন। ২০১৪ কারিতাস বরিশাল অঞ্চলের ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইসিডিপি-রাখাইন) জরিপ অনুযায়ী অত্র উপকূলীয় অঞ্চলের রাখাইন জনসংখ্যা প্রায় ২৫৬১। মোট ২৩৭ রাখাইন অধ্যুষিত পাড়া যার মধ্যে পটুয়াখালীর ১৪৪ টি (১৭৮৪-১৯৮৪) রাখাইন অধ্যুষিত পাড়া বা গ্রামের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৩২টি (কলাপাড়া ২৮ + গলাচিপা ৪, ২০১৫ খ্রীঃ) গ্রাম এবং বরগুনার ৯৩ টি (১৭৮৪-১৯৮৪ খ্রীঃ) রাখাইন পাড়া বা গ্রামের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ১৩টি গ্রাম রয়েছে। ২০২১ সালে সর্বশেষ পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ছয়আনিপাড়ার (টিকে থাকা সর্বশেষ ৬ টি রাখাইন পরিবার) উচ্ছেদ হয়ে যায় পায়রা তৃতীয় সমুদ্রবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণের আওতায় পড়ায় প্রায় তিনশ বছরের প্রাচীন আদিবাসী রাখাইনগ্রামটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (২০২১ সালে বিলিন/বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া গ্রামের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ১৯৩ টি তে।)

বরিশাল অঞ্চলে রাখাইন জনসংখ্যা:

১৭৮৪ থেকে ২০১৪ সাল

১৭৮৪-১৯০০	১৯৪৮	১৯৯০	২০১৪
১,০০,০০০	৩৫০০০-৫০০০০	৪০০০	২৫৬১



বরিশাল অঞ্চলে রাখাইন পাড়া/গ্রাম সংখ্যা: ১৭৮৪ থেকে ২০১৪ সাল এবং ২০২১ সাল

১৭৮৪-১৯৮৪		২০১৪ গ্রাম সংখ্যা	বিলুপ্ত পাড়া/গ্রাম সংখ্যা ১৯৮৪- ২০১৪	২০২১ সালে বিলুপ্ত পাড়া/গ্রাম সংখ্যা (পায়রা পোর্টে জমি অধিগ্রহণের ফলে)	২০২১ সালে গ্রাম সংখ্যা
পটুয়াখালী	১৪৪	৩২	১১২	১	৩১
বরগুনা	৯৩	১৩	৮০	-	১৩
মোট	২৩৭	৪৫	১৯২	১৯৩	৪৪

১৭৮৪-১৯০০	২০১৪
২৩৭টি গ্রাম	৪৫টি গ্রাম

২০২১		
কলাপাড়া, পটুয়াখালী, জেলা	গলাচিপা	বগুড়া জেলা, তালতলি এবং সদর
২৭	০৪	১৩
মোট: ৪৪টি (পায়রা পোর্টের জন্য একটা কমে যাবে)		

ভূমি না থাকলে কোথায় তারা উৎসব করবে, সামাজিক জীবন যাপন করবে? আদিবাসীদের নাচ-গান-উৎসব সব তো ভূমিকে কেন্দ্র করে। তাদের উৎসবগুলো ঋতু ও ভূমিকে নিয়েই। ফসল ফলানোর জন্য জমি তৈরি করা, বীজ বোনা, ফসল তোলা, ফসলের ব্যবহার, বিয়ে, জন্ম-মৃত্যু-আনন্দ, এর বাইরে কোনো নৃত্য, কোনো গান নেই তাদের জীবনে। ভূমিবিহীন আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষণ অসম্ভব। আদিবাসীরা বলে, আমাদের নিকট থেকে ভূমি কেড়ে নেয়ার অর্থ হলো একটি বাগান থেকে ফুল ছিঁড়ে নেয়ার মত। ভূমি নেই তো আনন্দ নেই, উৎসব নেই, সংস্কৃতি নেই। ভূমিহীন আদিবাসী সংস্কৃতিচর্চা করবে কোথায়, তার নৃত্য করার, কথা বলার, গান করার, মনের কথা বলার জায়গা কোথায়?

ভূমির এ এক করুণ কথা

একটি জতি সত্তার এ এক ভিন্ন রকম সংকট ও বিপর্যয় মানুষজাতির-শেষ ঠিকানা “শাশান” এর ভূমিটুকুও কেড়ে নিতে কুণ্ঠাবোধ করছেন। ভূমিগ্রাসীরা! এ যেন মানবতার এক চরম বিপর্যয়। উদাহরণ স্বরূপ কলাপাড়া উপজেলার খনজুপাড়া ও মিশ্রীপাড়া, দিয়ার আমখোলা পাড়া,

কালারচান পাড়া, তুলাতলী, নয়াপাড়া-বাবলাতলা, সোনাপাড়া, চৈয়পাড়া, হাড়িপাড়া এবং এক কথায় একইভাবে উভয় উপজেলার (তালতলী ও কলাপাড়া) সবকটি পাড়ার শাশান ভূমি দখল হচ্ছে। দখল হয়ে যাচ্ছে কুয়াকাটার পর্যটন ও হোটেল মোটেলের নামে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কুয়াকাটা পর্যটন থেকে ১কিঃমিঃ উত্তরে বঙ্গবন্ধু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত ১৯২৫ সালে নির্মিত বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ শয়নকৃত বুদ্ধ প্রতিকৃতি ও বিহার। রয়েছে ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত বছর) বুদ্ধাদ পূর্তিভূমি। এ সকল বর্তমানে রয়েছে মালিকানা কাঁটাতারের বেড়াজালে এবং বিহারের ৯৯ শতাংশের অধিক স্থানীয় পৌরভবনের প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, সিএস, আর এস, এস এ রেকর্ডে উক্ত জায়গাটি দেবালয় হিসাবে উল্লেখ আছে।

ভূমি সংক্রান্ত মামলায় দীর্ঘ

জটিলতার করুণ উদাহরণ

কারিতাস বরিশাল অঞ্চলের এই আইসিডিপি প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে দেখা যায়, মিসেস মাতেন (৪৮), পিতাঃ মৃতঃ চোচিংলা, গ্রামঃ বর্তমান করানীপাড়া। যার মামলা নম্বর ডিসিআর ৭২৯(এম) ৫৯-৬০। উক্ত মামলায় প্রজন্ম ক্রমে দীর্ঘ ৬০ বছর পর ২০১০ সালে এসে তা নিষ্পত্তি হয়।

গ্রামঃ আগাঠাকুর পাড়া (বর্তমানে মিঃ খেনমংলা চালাচ্ছেন) ১ম মামলা নং ৭৬/৪৬। প্রাথমিক রায় ডিক্রি পাওয়ার পরও ভূয়া/জাল চুক্তিপত্র/ নিলাম দেখিয়ে দখল নেয়। পুনরায় মামলা; এভাবে এই জমির মামলা এখনও চলমান। উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালের ঘূর্ণিঝড়ে কলাপাড়া ও আম-তলী ভূমি অফিসের নথিপত্র ভাসিয়ে নিয়ে যায়/নষ্ট হয়। রাখাইন কর্তৃক নিয়মিত জমির খাজনা প্রদান করা সত্ত্বেও এ ১৯৬২ সালকে ভিত্তি করে কতিপয় অসাধু ভূমিগ্রাসীরা ভূয়া নিলাম সৃষ্টি করে ভূ-সম্পত্তিগুলো প্রভাবশালীদের নামে বন্দোবস্ত করে নেয়। সুইচি মং, পিঃ সুইলা অং, গ্রামঃ সওদাগরপাড়া, উপঃ বর্তমান তালতলী, (পূর্বে আমতলী), জেলা : বরগুনা যার মিস



কেইস নং ৪৭৬/৮১, উক্ত মামলায় প্রজন্ম ক্রমে দীর্ঘ ৬৯, ৩৪ বছর অতিক্রান্ত হলেও তা আজও নিষ্পত্তি হয়নি। দখলকারী ব্যক্তি দখলকৃত জমির ধান বিক্রি করে উক্ত জমির মামলা চালান। অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্ত ও দখলচ্যুত রাখাইন ব্যক্তি তার পৈতৃকসূত্রে পাওয়া নিষ্কটক (যেখানে এখনও কোনো ব্যক্তি/মহল কর্তৃক দখল হয়নি) জমি খন্ড খন্ড বিক্রি করে মামলার খরচ চালান।

জানা যায়, উপজেলা শহরে এসে মামলার হাজিরা দিতে মামলা প্রতি উকিল খরচ, ক্লার্ক খরচ, হাজিরা কোর্ট ফি, সেরেস্টা, এজলাস সহ যাতায়াত ভাড়া, খাবার ও অন্যান্য সহ কমপক্ষে ৫,০০০ টাকা খরচ হয়। মাসে একবার অথবা ১৫ দিন পর পর আসতে হয়। আবার কখনও স্বাক্ষী প্রদানের জন্য একটানা ৭ দিন উপজেলা/জেলা শহরে অবস্থান করতে হয়। সেক্ষেত্রে খরচ দিগুণেরও বেশি করতে হয়।

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলা ও বরগুনার তালতলী/আমতলী উপজেলায় মোট ৬৫৫ (কলাপাড়া ৩৪০ ও তালতলী ৩১৫) রাখাইন পরিবার রয়েছে। উক্ত পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারই জমি জমা সংক্রান্ত বিষয় ভোগদখলের জটিলতায় গড়ে ২টি করে মামলা মোকদ্দমায় দীর্ঘকাল যাবত জড়িত হয়ে আছে।

এভাবে অজস্র উদাহরণ আছে, যা লিখতে গেলে তা রূপকথাকেও হার মানাবে।

বর্তমান প্রধান সমস্যাসমূহ

১. প্রতিটি রাখাইন পাড়ার/গ্রামের বৌদ্ধ বিহারের আশে-পাশের জায়গা কতিপয় প্রভাবশালী ও ভূমিহাসী কর্তৃক দখল হচ্ছে। কুয়াকাটায় অবস্থিত শতাব্দী প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ৯৯ শতাংশের অধিক জায়গা স্থানীয় পৌরভবনের প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যেখানে রয়েছে বাংলাদেশের প্রাচীন বৃহৎ গৌতম বুদ্ধের শায়িত মূর্তি;
২. প্রতিটি পাড়ার শ্মশান ভূমির চারপাশ বেদখল হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত অবৈধ দখলের সীমানা বাড়ছে। (কলাপাড়া উপজেলার কাঁলাচানপাড়া, হাড়িপাড়া সহ তালতলী উপজেলার তালতলী সদর, অংকুজানপাড়া উল্লেখযোগ্য);
৩. শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত রাখাইন পাড়ার রিজার্ভ পুকুর বেদখল হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ভূমি অফিস কর্তৃক লিজ/বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। (দিয়ার আমখোলা পাড়া, কালাচান পাড়া, হাড়িপাড়া, থঞ্জু পাড়া, লক্ষিপাড়া, নায়রী পাড়া);
৪. অবিরত ভূমি বেদখল এবং মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হারানি করা, অবিরাম/মামলার দীর্ঘসূত্রীতা, জমি সংক্রান্ত সহিংসতা হচ্ছে;
৫. গভীর রাতে রাখাইন বাড়ী ও গ্রামে প্রায়ই হামলার ঘটনা ঘটছে;

(কুয়াকাটার নয়াপাড়া, কালাচানপাড়া, নায়রীপাড়ায় সম্প্রতি এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বিষয়টি নিষ্পত্তি হলেও পরিবারগুলো আতঙ্কে, নিরাপত্তাহীনতায় আছে বলে তারা জানিয়েছে);

৬. চরম অর্থনৈতিক নাজুকতা ও সামাজিক পরিবেশ এবং নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে;
৭. বৌদ্ধবিহার থেকে ভগবান বুদ্ধমূর্তি, পিতলের ঘন্টা সহ আরো পূজার সামগ্রী চুরি হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এমন কোন রাখাইন গ্রাম/পাড়া পাওয়া যাবে না যেখান থেকে বুদ্ধমূর্তি চুরি হয়নি;
৮. রাখাইন সংস্কৃতি রক্ষা, বিকাশ ও চর্চার ব্যবস্থা না থাকা;
৯. বানিজ্যিক পর্যটন এলাকার নামে রাখাইনদের জমি দখল ও মার্কেট স্থাপনা সহ একশ্রেণীর স্থানীয় ভূমিদস্যু; কতিপয় অসাপু সাবেক ও বর্তমান ভূমি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিভিকিট ও অবৈধ হাউজিং ব্যবসা ও হারানি দিন দিন বৃদ্ধি হচ্ছে;
১০. রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ত্ব আইন ১৯৫০ এর ৯৭ অনুচ্ছেদ যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া;
১১. রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ত্ব আইন ১৯৫০ এর ৯৭ অনুচ্ছেদ যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া;
১২. প্রয়োজনীয় অর্থ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাত করণ ব্যবস্থা না থাকায় হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী রাখাইন তাঁত শিল্প;
১৩. রাখাইন নারীদের নিরাপত্তাহীনতা।

আদিবাসী ভূমি অধিকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি প্রসঙ্গ

জাতীয় ভূমি, পরিবেশ, পানি, প্রাণবৈচিত্র্য বিষয়ক বেশকিছু জাতীয় আইন ও খসড়া আইনে আদিবাসী অধিকারের প্রসঙ্গসমূহ ইতিবাচকভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান আইনসমূহের যথাযথ

প্রয়োগ স্থানীয় এলাকায় দেখা যায় না। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং আইনি কর্তৃপক্ষের অবজ্ঞা-অবহেলা এবং সকল আইন সম্পর্কে উপযোগী ও সর্বোপরি ধারণা না থাকাকেই অধিকাংশ মানুষ দায়ী মনে করেন।

রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ (ইস্ট বেঙ্গল এ্যাক্ট নং ২৮/১৯৫১) এর নিয়মানুযায়ী আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তরের উপধারা

উপধারা ২: কোন উপজাতি বা আদিবাসী তার ভূমি অনুরূপ আদিবাসী ছাড়া অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করলে তা বৈধ হবে না।

উপধারা ৩: আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তর ক্রয়-বিক্রয়, দান ও উইল প্রক্রিয়ায় হতে পারে। তবে বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তর আদিবাসীদের ভেতরই হতে হবে। কোন আদিবাসী তার ভূমি অন্য কোন আদিবাসীকে বিক্রয়, দান এবং উইল হস্তান্তর করতে পারে। অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট আদিবাসী তার ভূমি বিক্রয় করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে রেভিনিউ অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষে এ ধরনের হস্তান্তর হতে পারে।

উপধারা ৪: প্রত্যেক হস্তান্তর রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে হতে হবে এবং দলিল রেজিস্ট্রি হওয়ার পূর্বে এবং হোল্ডিং অথবা এর যে কোন খন্ডে হস্তান্তরিত হলে দলিল মতে এবং হস্তান্তরের শর্ত অনুযায়ী রাজস্ব অফিসারের লিখিত সম্মতি নিতে হবে।

উপধারা ৫: একজন আদিবাসী অন্য কোন বাংলাদেশি বা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অন্য আদিবাসীর নিকট স্বীয় জমি খাইখালাশী বন্ধকদিতে পারবে। এরূপ বন্ধকের মেয়াদ ৭ বছরের অধিক হবে হবে না বরং বন্ধকটি অবশ্যই ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী হতে হবে।

উপধারা ৮: যদি কোনো আদিবাসী রায়ত এই ধারার বিধানসমূহ লঙ্ঘন করে কোন হোল্ডিং বা এর অংশ হস্তান্তর করা হলে রাজস্ব অফিসার রাজস্ব রেভিনিউ অফিসারের

অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আদিবাসীর ভূমি অন্য কোন সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর হলে সেই হস্তান্তর বলবৎ হবে না।

ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪

ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী জোরপূর্বক আদিবাসীদের গ্রাম ও নিজস্ব বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা বে-আইনি। পল্লী এলাকায় বাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত কোন ভূমি হতে বাড়ির মালিককে উচ্ছেদ করা যাবে না (সূত্র: ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪)

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১ এ স্পষ্ট আদিবাসীদের ভূমি অধিকার বিষয়টি “উপজাতীয় সম্প্রদায়” হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোকে প্রচলিত আইন মোতাবেক ভূমির অধিকার প্রদানসহ তাদের সমাজগত অধিকার সংরক্ষণ করা হবে (সূত্র: জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১, ধারা ১৬.২৮)। এমনকি এই নীতিমালা অনুযায়ী আদিবাসীদের ভূমির প্রথাগত অধিকারের প্রতিও সমর্থন রেখেছে রাষ্ট্র, নীতিমালাতে আদিবাসীদের “সমাজগত অধিকার” সংরক্ষণের উল্লেখ রাখা হয়েছে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে একটি বিশেষ আন্ত: মন্ত্রণালয়ভিত্তিক জাতীয় কমিটি গঠন এবং জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিকে সাচিবিক সহযোগিতা করার জন্য ভূমিমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে আর একটি আন্ত: মন্ত্রণালয় ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (সূত্র: জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১, ধারা ১৮ ও ১৯)।

আদিবাসী অধিকার বিষয়ক

জাতিসংঘ ঘোষণা পত্রের ভূমি

অধিকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ২৮

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন কিংবা অন্যথায় ভোগ দখলকৃত বা ব্যবহারকৃত এবং তাদের স্বাধীন

পূর্বাহিত সম্মতি ছাড়া বাজেয়াপ্ত, হরণ, দখল ব্যবহার বা ক্ষতি সাধন করা ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদ যাতে তারা ফিরে পায় কিংবা তা সম্ভব না হলে ন্যায্য যথাযথ ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায় সেরূপ প্রতিকার পাওয়ার অধিকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রয়েছে।

আইএলও কনভেনশন নং-১০৭

অনুচ্ছেদ ১১, দ্বিতীয় অংশ: বলা হয়েছে, “সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত ভূমির উপর যৌথ কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করতে হবে” বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালের ২২ জুন আইএলও কনভেনশন- ১০৭ অনুস্বাক্ষর করেছে।

আইএলও কনভেনশন নং - ১৬৯

অনুচ্ছেদ ১৪.১ : আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে আয়ত্তকৃত জমির মালিকানার অধিকার ও ঐতিহ্যগতভাবে দখলীসত্ত্বও স্বীকৃতি দিতে হবে। অধিকন্তু ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহারকৃত জমি যা তাদের জীবনযাপন এবং ঐতিহ্যবাহী কার্যক্রমে ব্যবহার করতো সেগুলো রক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই মর্মে যাযাবর ও স্থান পরিবর্তনকারী চাষীদের অবস্থাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ১৪.২ : সরকার এসব জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে আয়ত্তকৃত ভূমি চিহ্নিত-করণ এবং তাদের মালিকানার অধিকার ও দখলিসত্ত্ব কার্যকরী নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধান করবে।

রাখাইনদের ভূমি সমস্যার সমাধানে সমন্বিত প্রস্তাব

রাখাইনদের ভূমি সমস্যার সমাধানে আমাদের কার্যকর সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রকল্পের সীমিত সহায়তার মধ্যে দিয়ে আদিবাসীদের দীর্ঘসময়ব্যাপী চলমান জটিলতা নিরসন সম্ভব নয়। সকল সমস্যা, দাবি-প্রস্তাব-সুপারিশ এসবের বাস্তবায়ন রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই করা জরুরি। সেইসাথে স্থানীয় প্রশাসনকেও সহায়তার হাত বাড়াতে হবে সমস্যা সমাধানে।

অবিলম্বে যেসব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন

১. বেদখলকৃত বৌদ্ধ বিহারের জমি মুক্ত করে রাখাইন কর্তৃপক্ষের নিকট ফিরিয়ে দেয়া। রাখাইনদের বেদখলকৃত শ্রাশান ভূমি দখলিমুক্ত করে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া এবং অবৈধ দখলদারীদের আইনের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করা।
২. রাখাইন ভাষা রক্ষার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে অবিলম্বে রাখাইন ভাষায় শিশু শিক্ষা কার্যক্রম শুরু এবং বিদ্যালয় সমূহে রাখাইন শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ দেয়া।
৩. রিজার্ভ পুকুর দখলিমুক্ত করে স্ব স্ব রাখাইনপাড়া কর্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে দেয়া।
৪. রাখাইন সংস্কৃতি রক্ষা, বিকাশ ও চর্চার লক্ষে রাখাইন কালচারাল একাডেমিকে সক্রিয় করা।
৫. বিকৃত করা রাখাইন পাড়ার নাম স্ব স্ব ঐতিহ্যগত নামে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা। (ছইসেন পাড়াকে করা হয় হোসেন পাড়া, দোকাশি পাড়াকে করা হয় দোভাষী পাড়া, থঞ্জু পাড়াকে করা অঞ্চু পাড়া, ফ্যাখি পাড়াকে করা হয় ফাঁসিপাড়া ইত্যাদি)
৬. যে সকল রাখাইন অধ্যুষিত গ্রামে শ্রাশান ভূমি নাই সেখানে অতি শীঘ্রই মৃতদেহ সংস্কারের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জায়গা বরাদ্দ দেয়া (কলাপাড়া সদর, কালাচান পাড়া, কুয়াকাটা পাড়া, নয়াপাড়া, নায়রী-পাড়া)।
৭. ভূমিদস্যু, স্থানীয় প্রভাবশালী ও সাবেক ভূমি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সিভিলিটে ভেঙ্গে অবৈধ হাউজিং ব্যবসা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
৮. রাখাইন তাঁতশিল্প টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা।
৯. স্থানীয় প্রশাসনের কমিটিতে রাখাইন সম্প্রদায় থেকে কমপক্ষে ৩ জন অন্তর্ভুক্ত করা।



১০. পটুয়াখালী ও বরগুনার সর্বশেষ যে ২৫৬১ জন রাখাইন বাস করছেন রাষ্ট্র ও সরকারকে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া এবং এই অঞ্চল থেকে যেন রাখাইন মানুষেরা চিরতরে হারিয়ে না যান তার নিশ্চয়তা প্রদান করার ব্যবস্থা করা।
১১. ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ত্ব আইনের ৯৭ ধারা পরিপূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা।
১২. সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা। ভূমি কমিশনের মাধ্যমেই স্থানীয় ভূমি বিষয়ক/মামলা, তথ্য-নথি, দলিল-পত্র সংরক্ষণ ও কর্ম প্রক্রিয়া সম্পাদন করা।
১৩. রাখাইনদের সংরক্ষিত পবিত্র-প্রথাগত ভূমি-বনভূমি, জলাভূমি, বৃক্ষ, দেবস্থান, মন্দির, বিহার, উৎসব ও মেলা এলাকা, প্রার্থনা এলাকা, সামাজিক রীতি ও আইনের মাধ্যমে পরিচালনা, রক্ষা-বিকাশের জন্য আইনগত ভাবে স্বীকৃতি, মর্যাদা ও দখলিমুক্ত করে রাখাইনদের হাতে তুলে দেয়া।
১৪. রাখাইনদের ঐতিহাসিক স্থান সমূহসহ নিজস্ব সংরক্ষিত এলাকা কোনভাবেই অধিগ্রহণ না করা।
১৫. বেদখলকৃত, অর্পিত শত্রু সম্পত্তির নামে দখলকৃত জমি-জবরদখল হওয়া সকল জমি ও ভূমি আইনগত স্বীকৃতিসহ রাখাইনদের মাঝে ফিরিয়ে দেয়া।
১৬. রাখাইন অধ্যুষিত স্থানীয় ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদে রাখাইনদের জন্য কমপক্ষে দুটো সংরক্ষিত আসন রাখা। (একজন নারী ও একজন পুরুষ) এবং স্থানীয়ভাবে রাখাইনদের জন্য ভূমি আদালত ও ভূমি পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা।
১৭. ভূমি বিষয়ক স্থানীয় সরকার কাঠামোতে স্থানীয় নিজস্ব শাসন কাঠামোর প্রতিনিধি নেতৃত্বকে মর্যাদার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা।
১৮. স্থানীয় খাসজমিতে রাখাইনদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা।
১৯. রাখাইনদের নিয়ে কোন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে তাদের পূর্ব অনুমতি সহ রাখাইনবান্ধব প্রকল্প হাতে নেয়া। সংরক্ষণ ও কর্ম প্রক্রিয়া সম্পাদন করা।

আমরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করি, রাখাইনদের ভূমি সমস্যা সমাধানে সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি গণমাধ্যমসহ এক বিশাল নাগরিক সমাজও এই বিরাজমান সমস্যা সমাধানে আরও অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠবে।

মেইনথিন প্রমীলা
আদিবাসী অধিকার কর্মী
promilapromi@yahoo.com



আইনগত সহায়তা ও নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তি

মোসাম্মৎ লাকী আক্তার

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার সকল নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা হলেও গ্রামীণ মানুষের জন্য বাস্তবে এই অধিকার প্রাপ্তি এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আইনি প্রক্রিয়ার জটিলতা, দূরত্ব, আর্থিক অসচ্ছলতা ও সচেতনতার অভাবে গ্রামের মানুষদের জন্য আদালতের দ্বার কার্যত বন্ধই থাকে। এই প্রেক্ষাপটে আইনগত সহায়তা বা ‘লিগ্যাল এইড’ কার্যক্রম হয়ে উঠেছে দরিদ্র মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

লিগ্যাল এইড বা আইনগত সহায়তা কী?

লিগ্যাল এইড (Legal Aid) হল আইনি সহায়তা, যা আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং বিচার লাভের সুযোগবঞ্চিত ব্যক্তিদের আইনি অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ, আইনি নথি প্রস্তুতকরণ এবং আদালতের কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা হয়। এটি এমন একটি

ব্যবস্থা, যেখানে দরিদ্র ও অসহায় মানুষ, যারা অর্থের অভাবে আইনজীবী নিয়োগ করতে পারে না, তাদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়। লিগ্যাল এইড এর মূল উদ্দেশ্য হলো সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, যাতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই আইনের আশ্রয় নিতে পারে।

আইনগত কাঠামো ও প্রতিষ্ঠা

Legal Aid Services Act, 2000 আইন অনুসারে “National Legal Aid Services Organization (NLASO)” গঠন করা হয়েছে। NLASO সরকারের তত্ত্বাবধানে কাজ করে এবং নিজ নিজ জেলায় “District Legal Aid Committee” গঠিত রয়েছে।

সেবা ও সুযোগ

১. আইনি পরামর্শ ও কোর্টে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা হয়, এমনকি কোর্ট ফি, ডিএনএ পরীক্ষা, বিজ্ঞাপন খরচ সহ বিভিন্ন খরচ কভার করা হয়।
২. হেল্পলাইন ১৬৪৩০ নম্বরে টেলিফোনে বা “BD Legal Aid” অ্যাপে দরিদ্র ও

অসহায় মানুষ বিনামূল্যে সহায়তা পেতে পারেন। যেমন; অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম বা গরিব ব্যক্তি, মহিলা ও শিশুরা, নির্যাতন বা পাচারের শিকার, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধা, বিধবা, দুর্বল ও নির্যাতিত ব্যক্তির, জাতিগত ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষ।

বাস্তব চিত্র: এক কমিউনিটি প্যারালিগালের অভিজ্ঞতা

রংপুর জেলার কোতোয়ালী থানার অধীনস্থ এলাকার নাগরিক উদ্যোগের একজন কমিউনিটি প্যারালিগাল, আব্দুল বারীর সহায়তায় সাদিয়া ইসলাম ন্যায় বিচার পেয়েছেন।

২৫ বছর বয়সী সাদিয়া ইসলাম তিন বছর ধরে তার স্বামী ও শাশুড়ির হাতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে চলতে থাকা এই নির্যাতনের কারণে তার গর্ভে থাকা সন্তানটি মৃত্যুবরণ করে। নির্যাতনের ভয় ও সামাজিক চাপে তিনি শুরুতে কাউকে কিছু জানাতে পারেননি। কিন্তু নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বাড়তে থাকায় একসময়



তিনি লুকিয়ে বাবার বাড়িতে চলে যান এবং সেখানে আশ্রয় নেন।

পরবর্তীতে সাদিয়া নাগরিক উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সাহস সঞ্চয় করে রংপুর সদর কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন। সেখানে তিনি একটি লিখিত অভিযোগ নিবন্ধন করেন। প্যারালিগাল আব্দুল বারী, তার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তার আশ্বাস দেন।

প্রথমে সালিশি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হলেও অভিযুক্তরা উপস্থিত না হওয়ায় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। সাদিয়া ইসলাম অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল হওয়ায় নাগরিক উদ্যোগ এর সহায়তায় প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের মাধ্যমে রংপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। পুরো প্রক্রিয়ায় আব্দুল বারী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাদিয়ার পাশে থেকে সহযোগিতা করেন।

এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, কমিউনিটি প্যারালিগালগণ কীভাবে প্রান্তিক জনগণের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

আব্দুল বারী বলেন, সাদিয়ার মতো অনেকেই ভয়ে কিছু বলতে পারেন না। আমরা যখন তাদের পাশে দাঁড়াই, তখন তারা সাহস পান। গ্রামে মেয়েরা জানেনই না কীভাবে মামলা করতে হয়, কোথায় যেতে হয়। এই ধরনের সহায়তা কেবল একজন নারীর প্রতি হওয়া নির্যাতনের অবসান ঘটায় না, এটা আশেপাশের মানুষদেরও অনুপ্রাণিত করে।

আইনগত সহায়তার ধরন ও পরিসর

সরকারি এবং বেসরকারি দুই স্তরেই গ্রামীণ জনগণের জন্য আইনগত সহায়তা চালু রয়েছে।

১. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (NLASO) - জেলা ও উপজেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ফ্রি আইনজীবী, মামলা খরচ, কনসলিয়েশন ইত্যাদি প্রদান করে।

২. স্থানীয় এনজিও - নাগরিক উদ্যোগ, ব্লাস্ট, ব্র্যাক সহ অনেক বেসরকারি সংস্থা গ্রামীণ প্যারালিগাল কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৩. মোবাইল লিগ্যাল এইড ক্লিনিক ও ADR (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) - সরাসরি

গ্রামে গিয়ে স্থানীয় বিরোধ মীমাংসায় সহায়তা করা হয়, যাতে দ্রুত ও খরচবিহীন সেবা দেওয়া যায়।

কী ধরনের সংকট বা সমস্যা তৈরি হয়?

১. আইন বিষয়ে অজ্ঞতা: অনেক গ্রামীণ মানুষ জানেন না যে তারা বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা পেতে পারেন। বিশেষ করে নারীরা নিজেদের অধিকারের বিষয়ে প্রায়ই অনিশ্চিত থাকেন। তারা জানেনই না কোথায় গেলে তার নির্যাতন বন্ধনোর প্রতিকার পাবেন।

২. সামাজিক ও পারিবারিক বাধা: অনেক সময় পরিবার বা সমাজই মামলা করতে বা আইনি সহায়তা নিতে নিরুৎসাহিত করে, বিশেষ করে নারী নির্যাতন, জমি বিরোধ বা বিবাহ বিচ্ছেদ ইস্যুতে।

৩. দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা: প্রায় ৪০ লাখ মামলাজটের কারণে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যমান আদালতের প্রতিকার পাওয়া দুরূহ বটে! প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাই প্রায়শই সালিশির জন্য অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়, যা আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় প্রভাবশালীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আইনি প্রক্রিয়া অনেক সময়

দীর্ঘ হয়, যার ফলে মানুষ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। ফলোআপ বা শুনানিতে উপস্থিত হওয়াটাও গ্রামের মানুষের জন্য কষ্টকর।

ফলে নারী ও সংখ্যালঘুদের সুবিচার প্রাপ্তির আশা অনেকাংশেই অধরাই থেকে যায়। এই সমস্যার সমাধানকল্পেই স্থানীয় সরকার বিভাগ এর পাশাপাশি নাগরিক উদ্যোগ এর সহযোগীতায় গ্রামীণ নারী, শিশু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুবিচার প্রাপ্তিতে কাজ করছে “কমিউনিটিভিত্তিক বিরোধ মীমাংসার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে জেভার ন্যায্যতাভিত্তিক অভিগম্যতা বৃদ্ধি” প্রকল্প।

নারীর আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়লে ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সহজ হয়

নারীরা বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা আইনগত অধিকার, প্রতিকার এবং সহায়তা থেকে বঞ্চিত থাকেন। বিশেষ করে পারিবারিক নির্যাতন, যৌতুক, উত্তরাধিকার, বাল্যবিয়ে ইত্যাদি বিষয়ে নারীরা সচরাচর ন্যায়বিচার পান না মূলত সচেতনতার অভাবে। আইন সম্পর্কে জানার সুযোগ না থাকায় তারা হয়রানির শিকার হন বা নিরব থেকে যান। এই প্রেক্ষাপটে আইন সচেতনতা নারীদের ক্ষমতায়নে একটি মৌলিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রামীণ জীবনে নারীর অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির চিত্র

অনেক নারী জানেন না যে তারা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হলে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে বা তারা কোথায় লিগ্যাল সাপোর্ট পেতে পারেন। একজন নারী নির্যাতনের শিকার হলেও পরিবার, সমাজ কিংবা ভয়ের কারণে কিছু বলতে পারেন না। অধিকাংশ নারী নিজেদের অধিকারহীন মনে করেন - এই ভাবনা ভাঙতে হলে প্রথম ধাপ হচ্ছে তাদের আইন সম্পর্কে সচেতন করা। যা নাগরিক উদ্যোগ সচেতনতামূলক সভা ও উঠান বৈঠক এর মাধ্যমে করে যাচ্ছে।

সরকারি-বেসরকারি দুটি গবেষণায় দেখা যায়, দেশে দুই-তৃতীয়াংশ নারী পারিবারিক

নির্যাতনের শিকার হলেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হার মাত্র ৩ শতাংশ। সচেতনতার অভাব, সংসারে টিকে থাকার ইচ্ছা, লোকলজ্জা ও অর্থ খরচের ভয়ে অধিকাংশ নারী থানায় অভিযোগ করেন না।

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ অথবা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩ ও ২০২৩) বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক আইনে তাঁরা বিচার চান না। এতে বলা হয়েছে, নানামুখী নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে তাঁরা অনেক সময় বুঝতে পারেন না, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ফলে নির্যাতনের শিকার হলেও মাত্র ১৬ শতাংশ মামলা করেন।

চর, উপকূল, পার্বত্য ও হাওর এলাকার ১৪ জেলার ১৪টি উপজেলার ২৮টি ইউনিয়নে বেসরকারি সংস্থা ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’ পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়েছে, গত বছর প্রায় ৩১ শতাংশ নারী শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

পাশের লোকালয়ে তাঁতের খুটখাট শব্দ বা পাওয়ার লুমের (বৈদ্যুতিক তাঁত) অবিরাম যান্ত্রিক শব্দ। নির্জন গ্রামে রাত ১১টা পর্যন্ত তাঁতের শব্দ এলাকার মানুষের নাকি গা-সওয়া হয়ে গেছে। সেই রকমই পারিবারিক নির্যাতনও ভয়াবহভাবে তাঁদের যেন গা-সওয়া হয়ে উঠেছে।

নারী নির্যাতন বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ ‘রিপোর্ট অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন সার্ভে ২০১৫’ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ৭৩ শতাংশ নারী কোনো না কোনো সময় স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু ৩৯ শতাংশ নারী অভিযোগ করার প্রয়োজন বোধ করেন না। লোকলজ্জা, সামাজিক মর্যাদা, পরিবারের সম্মানহানির ভয়ে প্রায় ২৭ শতাংশ নারী অভিযোগ জানাতে চান না।

BBS এবং UNFPA এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের সর্বশেষ জাতীয় পর্যায়ের জরিপটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০২৪ সালে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ৭০% নারী Lifetime অর্থাৎ জীবনে অন্তত একবার বিবাহিত/বন্ধনমূলক সম্পর্কের মাধ্যমে Intimate Partner Violence (IPV)-এর শিকার হয়েছেন। প্রায় ৪১% নারী গত ১২ মাসে IPV-র শিকার হয়েছেন এবং ৬৪% নারী যাঁরা শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কাউকে জানাননি।

অভিযোগ না করার কারণগুলোর মধ্যে প্রধানত:

- হটলাইনের বিষয়ে অজ্ঞানতা: মাত্র ৪৫% নারী ৯৯৯ নম্বরটি জানেন, এবং মাত্র ১২% ১০৯ নম্বরের সাথে পরিচিত।

- চিকিৎসা বা আইনি সহায়তার খরচ: গড় খরচ ছিল চিকিৎসায় প্রায় ২,৫১২ টাকা এবং আইনি সহায়তায় প্রায় ৪,১০৪ টাকা, যা অনেকের জন্য জটিল।

কেন নির্যাতন মেনে নেন অধিকাংশ নারী?

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ‘উইমেন অ্যাকসেস টু জাস্টিস ইন বাংলাদেশ: অ্যাভিনিউস ফর রিফর্ম’ (বাংলাদেশে নারীদের ন্যায়বিচারের সুযোগ: সংস্কারের পথ) শীর্ষক গবেষণা চালায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও ইউএন উইমেন। প্রকাশিতব্য প্রতিবেদনটির গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমীন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আইনি কাঠামো থাকলেও সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তা নারীর সুরক্ষা দিতে পারছে না। লোকলজ্জার মতো সামাজিক সংস্কার, নির্যাতন মেনে নেওয়া, নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ করলে কী প্রতিক্রিয়া হবে, সেই ভয়, অর্থনৈতিক অসাম্য, পুরুষের ওপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ও সচেতনতার অভাব নারীর ন্যায়বিচার চাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। আর প্রাতিষ্ঠানিক বাধার মধ্যে রয়েছে পুলিশের তাৎক্ষণিক সাড়া না দেওয়া, মামলা করা ও চালানোর নানা বাধা, মামলার পেছনে

কে দৌড়াবে! বাবা-মা মেনে নিচ্ছে, আমিও মেনে নিছি। নির্যাতন সয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এছাড়া, বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আদালতের বাইরে সালিসে বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করেন তারা।

সরকারি প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ঘাটতি

২০০০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৪টি ওসিসিতে ৬২ হাজারের বেশি নারী ও শিশু সহায়তা পেয়েছে। এর মধ্যে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন ৬১ শতাংশ। মামলার হার মাত্র ৩১ শতাংশ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসির আইন কর্মকর্তা তাহমিনা নাদিরা বলেন, স্বামীর হাতেই বেশির ভাগ শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এলে তাঁদের ওসিসিতে পাঠানো হয়। বিবাহবিচ্ছেদ ও সন্তানের ভরণপোষণ না পাওয়ার ভয়ে এবং অর্থের অভাবে মামলা করতে চান না বেশিরভাগ নারী।

নির্যাতন মেনে নেওয়ার মানসিকতা বদলাতে হবে

অধ্যাপক উমর ফারুক মনে করেন, পারিবারিক নির্যাতনকে ‘ব্যক্তিগত সমস্যা’ হিসেবে চিহ্নিত করার মানসিকতা ছাড়তে হবে। পারিবারিক সংস্কৃতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হতে হবে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের আইনটি প্রয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে। বিচারপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা দূর করতে হবে। নারীকেও নিজের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

আইন সম্পর্কে সচেতনতা কীভাবে নারীদের ক্ষমতায়ন করে?

- আইন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হলে নারী জানেন যে তিনি উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী সম্পত্তির দাবিদার অথবা তার উপর সহিংসতা হলে আইনি প্রতিকার রয়েছে;
- আইন সম্পর্কে সচেতনতা একজন নারীকে সাহস যোগায়, তার ওপর অন্যায় হলে মুখ খুলতে উৎসাহিত করে;

• আইন সম্পর্কে সচেতনতা থাকলে একজন নির্যাতিত নারী আইনি সহায়তা কেন্দ্র, থানায় জিডি করা, অথবা আদালতে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন;

• পারিবারিক ও সামাজিক সম্মান অর্জন করতে পারেন অন্য নারী জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারেন।

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আইন সম্পর্কে সচেতনতা একটি অপরিহার্য উপাদান। একজন সচেতন নারী কেবল নিজের জন্যই নয়, তার পরিবারের জন্যও নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারেন। তাই আইনগত জ্ঞানের বিস্তার ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করলেই নারীরা সাহসের সঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন, এবং প্রকৃত অর্থে ন্যায়বিচার সহজ হবে।

বাল্যবিয়ে: একটি সমাজ-আইন বিরোধী বাস্তবতা

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ একটা ব্যাধির মতো। দেশের বেশিরভাগ মেয়েশিশু বাল্যবিয়ের মতো অন্যায়ের শিকার হয়। যেখানে তাদের শৈশব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বাধাগ্রস্ত হয়। বাল্যবিয়ে একটি আইনগত অপরাধ হলেও, অনেক অভিভাবক এই বিষয়টি বোঝেন না বা সামাজিক চাপে মাথা নোয়ান। এই প্রেক্ষাপটে আইন সচেতনতা শিশুদের, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে অনেক জায়গায় এখনো সামাজিকভাবে গৃহীত, যদিও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের এবং ২১ বছরের কম বয়সী ছেলের বিয়ে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ।

তবে অনেক বাবা-মা কুসংস্কার, নিরাপত্তার ভয় অথবা দারিদ্র্যের কারণে মেয়েকে কম বয়সে বিয়ে দেন। এতে করে:

- শিশুর শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায়,
- প্রজনন স্বাস্থ্য হুমকিতে পড়ে,
- নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়ে।

আইন সচেতনতা কীভাবে বাল্যবিয়ে রোধে সহায়তা করে?

✓ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন আইন সম্পর্কে প্রচারের ফলে মা-বাবা বুঝতে পারেন বাল্যবিয়ে আইনত অপরাধ এবং তার জন্য শাস্তি হতে পারে।

✓ কিশোরী নিজেই প্রতিবাদ করতে শেখে, অনেক কিশোরী এখন আইন জানার ফলে নিজের বিয়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারে এবং সহায়তা চাইতে জানে।

✓ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে শিক্ষকরা সক্রিয় হন এবং বিয়ের ঝুঁকিতে থাকা মেয়েদের রক্ষা করতে পারেন।

✓ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সম্পর্কে সচেতনতা থাকার কারণে স্থানীয় চেয়ারম্যান, পুলিশ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিশুদের বিয়ে আটকাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেন।



বাস্তব অভিজ্ঞতা: এক সুচরিতার গল্প

বরিশাল জেলার উদয়কাঠী ইউনিয়ন ৬নং ওয়ার্ডের তেতলা গ্রামের ১৫ বছর বয়সী সুচরিতা আক্তারকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। সে নাগরিক উদ্যোগ আয়োজিত একটি স্কুলে “আইন সচেতনতামূলক সেশনে” অংশ নিয়েছিল যেখানে বাল্যবিয়ের ক্ষতি ও প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেখান থেকে পাওয়া সাহস ও জ্ঞান দিয়ে সুচরিতা আক্তার, নাগরিক উদ্যোগ এর কমিউনিটি প্যারালিগাল মাসুম বিল্লাহকে

জানায়। মাসুম বিল্লাহ ইউপি সদস্য মনু মিয়া ও নারীনেত্রী সাংস্কৃতিক সম্পাদক রানা বাউঁ কে নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করলে পুলিশ এসে বিয়ে বন্ধ করে দেয় এবং অভিভাবকদের সতর্ক করে। সুচরিতা আক্তার বর্তমানে ৯ম শ্রেণিতে পড়ছে এবং অন্যদেরও সচেতন করতে উৎসাহী।

আইন সম্পর্কে সচেতনতা শিশুর জীবন বাঁচাতে পারে - এটি আর শুধু তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বাস্তবেই তা সম্ভব। কিশোর-কিশোরী যখন জানে যে তাদের অধিকার আছে এবং বাল্যবিয়ে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ-তখন তারা সাহসী হয়, প্রতিবাদ করে এবং অন্যদেরকেও সচেতন করে তোলে। তাই শিশুদের অধিকার রক্ষায় আইন সচেতনতা সম্প্রসারণ এখন সময়ের দাবি।

কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনের চিত্র

✓ কমিউনিটি প্যারালিগালের মাধ্যমে মামলা করার পর অনেকেই প্রথমবারের মতো বিচার প্রাপ্তির স্বাদ পান।

✓ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) পদ্ধতিতে জমি বিরোধ, দেনা-পাওনা বা পারিবারিক ঝামেলা দ্রুত সমাধান হচ্ছে।

✓ মোবাইল লিগ্যাল এইড ক্লিনিক বা আইন সহায়তা মানুষের মাঝে বড় ধরনের সচেতনতা তৈরি করেছে।

✓ কিশোরী নিজেই প্রতিবাদ করতে শিখেছে। অনেক কিশোরী এখন আইন জানার ফলে নিজের বিয়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারে এবং সহায়তা চাইতে জানে।

গ্রামীণ নারী ও শিশুদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য আর কী কী করা যেতে পারে

- গ্রামে গ্রামে কমিউনিটি প্যারালিগাল ও আইন সহায়তা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো;
- আইন বিষয়ক তথ্য রেডিও/কমিউনিটি থিয়েটার/লোকগান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার;
- নারীদের জন্য আলাদা, নিরাপদ সহায়তা ডেস্ক স্থাপন;

- মামলা পরিচালনায় মনিটরিং সিস্টেম উন্নয়ন;

- স্থানীয় নারী নেত্রী ও কমিউনিটি প্যারালিগালদের বেশি সম্পৃক্ত করা;

- নারীদের নিরাপদ আইন সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন;

- মিডিয়ায় নারী অধিকার ও আইন নিয়ে বেশি প্রচার;

- প্রতিটি স্কুলে বছরে অন্তত ২ বার আইন সচেতনতামূলক সেশন;

- শিক্ষক, ইমাম, জনপ্রতিনিধিদের আইন সচেতনতা প্রশিক্ষণ;

- বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করেছে, তাদের গল্প প্রচার করা।

এখনও কী কী চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে

- সামাজিক সংকোচ ও লজ্জা: নারী অনেক সময় ভাবেন আইনগত পদক্ষেপ মানেই সমাজে বদনাম।

- পারিবারিক বাধা: পরিবারই অনেক সময় মেয়েকে থামিয়ে দেয়।

- পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি: অনেকে মনে করেন নারী আইনের আশ্রয় নিলে সে 'বিদ্রোহী'।

- সচেতনতার অভাব: গ্রামের অনেক মানুষ এখনো জানেন না যে, তারা আইন সহায়তা পেতে পারেন এবং তা বিনামূল্যে পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ফলে অনেকেই অন্যায় সহ্য করেও ন্যায়বিচার চাওয়ার উদ্যোগ নেন না।

- ভৌগোলিক দূরত্ব ও যোগাযোগ সমস্যা: প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের কাছে তথ্য বা সেবা পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় লিগ্যাল এইড অফিস বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সেবায় পৌঁছাতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়, যা সময় ও অর্থ দুই দিক থেকেই বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

- সামাজিক ও পারিবারিক চাপ: বিশেষ করে নারী ও শিশু নির্যাতনের মতো বিষয়গুলোতে অনেক ভুক্তভোগী সমাজ

বা পরিবারের চাপে আইনি পদক্ষেপ নিতে পারেন না। লজ্জা, ভয় বা মানসম্মানের ভয়ে তারা নীরব থাকেন।

- প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা: ডিজিটাল সেবা বা অনলাইন লিগ্যাল এইডের উদ্যোগ থাকলেও গ্রামের অনেক জায়গায় ইন্টারনেট সংযোগ, ডিভাইস ব্যবহার ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে এসব সুযোগ তারা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেন না।

- মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা: বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় নিয়ে ফেলে এই ধারণা গ্রামের জনগণের মধ্যে প্রচলিত। এতে তারা অনেক সময় মামলা করতে নিরুৎসাহিত হন এবং বিকল্পভাবে প্রভাবশালীদের মাধ্যমে 'সমাধান' খোঁজেন।

মোসাম্মৎ লাকী আক্তার

প্রকল্প সমন্বয়কারী, নাগরিক উদ্যোগ
lakiakter4477@gmail.com

রেফারেন্স:

1. National Legal Aid Services Organization (NLASO): <https://www.nlaso.gov.bd/>
2. BRAC Human Rights and Legal Aid Services (HRLS) Unit Reports
3. Access to Justice for the Poor – UNDP Bangladesh, 2022
4. Nagorik Uddyog – Legal Empowerment Model Documentation
5. Paving the Way to Justice: The Experience of Nagorik Uddyog”- Dina M. Siddiqi
6. BLAST Annual Report, 2023
7. Interview with field community paralegal, Rangpur and Barisal, June 2025
8. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭
9. Plan International – “Child Marriage in Bangladesh”, 2023
10. Girls Not Brides Bangladesh Network
11. Interview with adolescent girls
12. UNFPA - Bangladesh UNFPA - Bangladesh
13. প্রথম আলো, ০৮ মার্চ, ২০২৪



দলিত নারীর এগিয়ে চলার গল্প

বাসন্তি সাহা

দলিত সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ বংশপরম্পরায় পরিচ্ছন্নতা কর্মী। তাদের সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেবা দেয়ার পরেও জাত-পাত-এর কারণে এখনও তারা অচ্ছুৎ এবং সমাজে একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে রয়ে গেছে। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধায় তারা সবচেয়ে নিম্নস্তরে। তারা তাদের বংশগতভাবে চর্চিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীর কাজকে ছোট করে দেখেন না আবার অচ্ছুৎ হিসেবে তারা একই ধরনের পেশায় আটকে থাকতেও চান না। পরিচ্ছন্নতা কাজের বাইরে সমাজের যে পেশাগত বৈচিত্র্য আছে সেখানে তারা তাদের অভিজ্ঞম্যতা চান। তাদের পেশা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবই নতুন করে বেছে নেবার সুযোগ তৈরি করতে চান এমনই কিছু অদম্য নারীর গল্প।

পূজা রানী দাস

মিরনজিল্লা সিটি কলোনির দলিত পরিবারে জন্ম পূজার। পূজা (২৪) দলিত সমাজের কানপুরী সম্প্রদায়ের মেয়ে। মা ও ভাই পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বাবাও ছিলেন পরিচ্ছন্নতা

কর্মী। পূজার বড় দু'বোন লেখাপড়ার সুযোগই পায়নি। কিন্তু পূজা স্বপ্ন দেখেছিল, সে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নয়, সে লেখাপড়া করবে, মানুষের জন্য কাজ করবে।

মায়ের উপার্জনে দু'ভাইবোনের লেখাপড়া যে কত কঠিন, এটা খুব ছোটবেলায়ই বুঝতে পেরেছিলেন। মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠন নাগরিক উদ্যোগ এর শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ থেকে এইচ এস সি শেষ করেন পূজা। সংসারে অভাবের কারণে স্নাতক পর্যায়ে লেখাপড়া শুরু করতে পারেননি তখন। শুধু তাই নয়, মিরনজিল্লা সিটি কলোনি উচ্ছেদের শিকার হয়েছে তার পরিবার, সিটি কর্পোরেশন থেকে ভেঙে দেয়া হয়েছে পূজার মাথাগোঁজার ঠাইটুক। পূজার পরিবার এখন আশ্রয় নিয়েছে এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

তবুও পূজা তার স্বপ্ন ভোলেনি। কয়েক বছর বিরতির পরে এই বছর নিউ মডেল কলেজ এ স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে পূজা। পাশাপাশি নাগরিক উদ্যোগ এর একটি

প্রকল্পে কমিউনিটি মোবাইলাইজার হিসেবে কাজ করছেন। পূজা বলেন, আমাদের কলোনির অধিকাংশ মানুষ মনে করেন, মেয়েদের জীবন সংসার ও বাচ্চা লালন-পালনের জন্য। কিন্তু আমি আমি উচ্চশিক্ষা নিয়ে আমি আমাদের কলোনির প্রত্যেকটা মেয়েকে উদ্বুদ্ধ করতে চাই। সবাইকে দেখিয়ে দিতে চাই, দারিদ্র, বৈষম্য, সামাজিক বঞ্চনা পেরিয়ে এই সমাজের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সম্ভব। ছোটবেলা থেকে মাকে শুধু পরিশ্রমই করতে দেখেছি। এবার তাঁর মুখে হাসি ফোটাতে চাই।

বিজয়তি কেশ

ছোটবেলা থেকে লেখাপড়ায় ভালো ছিল বিজয়তি। বাবা স্বপ্ন দেখেছিলেন, কেবল পরিচ্ছন্নতা কর্মী হয়ে বেঁচে থাকবে না আমার মেয়ে। আমার মেয়ে শিক্ষক হবে। সেই স্বপ্নকে সামনে রেখে বিজয়তি অতিক্রম করেছে শিক্ষায় একটির পর একটি ধাপ।

বিজয়তি কেশ (২৮)। গনকটুলি সিটি কলোনির হরিজন সম্প্রদায়ের মেয়ে। বাবা, ভাই, স্বামী তিনজনই পরিচ্ছন্নতা কর্মী।

স্কুলে পড়ার সময় কোনো শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ানোর সার্মথ্য ছিল না তার বাবার। অংক বই নিয়ে বড় ভাইবোনদের কাছে ঘুরতেন। যদি কারও সাহায্য পাওয়া যায়। এভাবে স্কুল-কলেজ পার করেছেন তিনি। ইডেন কলেজ থেকে ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স শেষ করার পর বিজয়তি কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন হলি চাইল্ড পাবলিক স্কুলে। লেখাপড়া করতে করতেই বিয়ে হয়ে যায়। দুটো মেয়েও আছে তার। তবু পরিবারের সকলের উৎসাহে তিনি এখন কাজ করছেন দলিত নারীদের উন্নয়ন সংগঠন ‘দলিত নারী ফোরাম’ এ।

বিজয়তির ইচ্ছে, তার মতো আরও অনেক দলিত মেয়ে লেখাপড়া করুক, কাজ করুক। বিজয়তি তাদের এই পথ তৈরির জন্য কাজ করতে চান। চাকুরি, সংসার, নিজেদের বাচ্চাদের দেখাশোনার পাশাপাশি কলোনীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ান তিনি। তিনি বলেন, আর কতদিন আমরা বংশপরম্পরায় পরিচ্ছন্নতা কর্মী হবো? আমাদের ছেলে-মেয়েরা যেনো এই জাত-পাতের বন্ধনা থেকে বের হতে পারে।

সরস্বতী দাস

সরস্বতী বড় হয়েছেন গাবতলী সিটি দলিত কলোনিতে। সরকারি ইম্পাহানী কলেজ থেকে সমাজ বিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছেন। বর্তমানে নাগরিক উদ্যোগের একটি প্রকল্পে প্রজেক্ট অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। বাবা জাতীয় সংসদের পরিচ্ছন্নতা কর্মী ছিলেন। সরস্বতীর বাবা যখন মারা যান তখন সে কেবল এসএসসি শেষ করেছেন। মা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাস্টাররোলের পরিচ্ছন্নতা কর্মী। দুইবোন এক ভাই নিজেরাই নিজেদের খরচে লেখাপড়া করেছেন। ভাইও মায়ের সাথে মাস্টাররোলে পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কাজ করছেন। বোন লেখাপড়া বেশি করেননি, বিয়ে হয়েছে। সরস্বতী তেলেগু সম্প্রদায়ের মেয়ে। তিনি জানান, এই সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা কোনো স্বপ্ন দেখে না। ছেলেরা লেখাপড়া শিখলেও পরিচ্ছন্নতা কর্মী হতে চায়। আমাদের দেখে গাবতলী সিটি কলোনীর কয়েকজন মেয়ে স্বপ্ন দেখছে

শিক্ষক হবার। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য বড় কিছু হবার স্বপ্ন তারা দেখেই না। কারণ জন্ম থেকে সবাইকে পরিচ্ছন্নতা কর্মী হতেই দেখেছে। কলোনি একটা ঘরে ৫/৭জন মানুষ একসাথে থেকে ৬/৭ পরিবার একটা কমন ওয়াশরুম ব্যবহার করে তারা বড় হবার স্বপ্ন দেখতে ভুলে যায়। জাতপাতের কারণে তারা এই চক্র থেকে বের হতে পারে না। আমারও স্বপ্ন ছিল শিক্ষক হবো।

বাবা ছাড়া মায়ের সামান্য আয়ে সরস্বতী দাসের লেখাপড়া সহজ ছিল না। অনেক বার ভেবেছেন আর হবে না। নিজের প্রাইভেট পড়ানোর টাকা, নাগরিক উদ্যোগ এর শিক্ষাবৃত্তি ও কিছু সহদয় মানুষের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত এসেছেন সরস্বতী।

সরস্বতী আরও জানান, এখন আমি যে কাজ করছি সেখানে দলিত সমাজের নারীদের উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। আমি চাই, আমাদের দেখে আরও মেয়েরা এগিয়ে আসুক। নতুন দিনের স্বপ্ন দেখুক।



মাররা ইশরাম্মা

মাররা ইশরাম্মা (২২)। গোপীবাগ দলিত সিটি কলোনীর তেলেগু সম্প্রদায়ের মেয়ে। পড়াশোনা করছেন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অর্নাস দ্বিতীয় বর্ষে সেন্ট্রাল উইমেন কলেজে। কলেজে পড়ার সময় নাগরিক উদ্যোগ থেকে সহায়তা পেয়েছে। ইশরাম্মা এই কলোনীর তেলেগু সম্প্রদায়ের প্রথম নারী যে, উচ্চশিক্ষায় আসতে পেরেছে।

ইশরাম্মার পূর্বপুরুষ এই দেশে এসেছিল, পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে প্রায় দু’শ বছর আগে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে। বর্তমানে গোপীবাগ দলিত কলোনীর একটি ঘরে দাদী, বাবা মা নিয়ে বাস করছেন। ৫টি

পরিবারকে একটি ওয়াশরুম ব্যবহার করতে হয় এখানে। বাবা রেল বিভাগের পরিচ্ছন্নতা কর্মী। বাড়িতে এখনও সবাই তেলেগু ভাষায় কথা বলেন, বাংলা ভাষায় এখনও তেলেগুর টান থেকে গেছে।

কলোনির প্রায় সবাই বংশপরম্পরায় পরিচ্ছন্নতা কর্মী। ছেলেরাও সবাই এই পেশার দিকেই ঝুঁকছে। কেবল কয়েকজন নারী এগিয়ে এসেছি উচ্চশিক্ষায়। তারা এই জাতপাত নির্ভর পেশার বাইরে অন্যরকম কিছু করার স্বপ্ন দেখে। ইশরাম্মা লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষক হতে চায়। তাকে দেখে এই সম্প্রদায়ের আরও ২/৩জন মেয়ে এগিয়ে এসেছে উচ্চ শিক্ষায়। ইশরাম্মা তাদের পড়ালেখায় সাহায্য করার পাশাপাশি উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে। ইশরাম্মা শিক্ষক হয়ে তার সম্প্রদায়ের মেয়েদের পড়াতে চায় যেন তারা একটি নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারে।

দলিত সম্প্রদায়ের নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে নাগরিক উদ্যোগ এর প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বাংলাদেশে অনেক কাজ হয়েছে কিন্তু সেখানে প্রান্তিক নারীদের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকেছে। মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন: হিজরা, দলিত এরা অধিকার ও এই নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য গোষ্ঠীগুলো একসাথে কাজ করতে চায় না।

সামাজিক পরিচয় নির্বিশেষে নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য এই প্রবণতা থেকে বের হওয়া দরকার। এছাড়া, তাদের ঐতিহ্যগত যে পেশা সেই পেশার বাইরে কেউ কাজ করতে চাইলে তাকে সেই সুযোগ দিতে হবে। সেখানেও দেখেছি সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে নানারকম কাঠামোগত বা সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আজকাল কোটা নিয়ে এতো কথা হচ্ছে কিন্তু যেসব জনগোষ্ঠী তাদের জাত-পাত-বর্ণের কারণে বৈষম্যের শিকার তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় একটা সংরক্ষণ নীতি থাকতে হবে। সেই সাথে নারীদের শিক্ষায় ও কাজে অংশগ্রহণের জন্য নিজস্ব কউমিউনিটির যে বাধা আছে সেটাকে অতিক্রম করার জন্যও কাজ করতে হবে।

জোবাইদা নাসরিন, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন বিদ্যমান সমাজ কাঠামোতে কাজের এই বিভাজন সম্পর্কে বলেন, কাজের এই ধারণা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তৈরি হয়েছে।

একজন চিকিৎসক যেমন সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মীও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। বংশপরম্পরায় যারা পরিচ্ছন্নতা কর্মী তাদের এতোদিনের চর্চিত কাজ কোনো অংশেই ছোট নয়। তবে কাজের বৈচিত্র্যের কারণে কোনো নারী যদি চায়, সে লেখাপড়া শিখে ব্যাংকের চাকুরি করতে পারে আবার পরিচ্ছন্নতা কর্মীও হতে পারে। সেগুলোর কোনোটাকে নিচু বা সফল এভাবে দেখার সুযোগ নেই।

আমাদের বিদ্যমান অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজে পেশাভিত্তিক অসমতা তৈরি করে যা রাষ্ট্রকে অগ্রসর হতে বাধা দেয়। দলিত নারী বা পুরুষদের কেবল পরিচ্ছন্নতা কর্মী হয়ে থাকার কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধাগুলোতে তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত। ফলে তাদের বঞ্চনা রয়েই গেছে।

এই বঞ্চনার অবসান হতে হবে। আমাদের সামষ্টিক চেতনায় সকল পেশাকে সমান মর্যাদায় দেখতে হবে।

বাসন্তি সাহা

কান্ট্রি ফোকাল পয়েন্ট- বাংলাদেশ
এশিয়া দলিত রাইটস ফোরাম।
basantitaposh@gmail.com



২০২৪ সালের শ্রম ও শিল্প পরিস্থিতি: একটি পর্যালোচনা

মোঃ আবু নাহের (মাসুদ)

পৃথিবীতে মানবসভ্যতার সূচনার মূলে ছিল অগণিত মানুষের শ্রম। তারপর শ্রমিকের হাতুড়ির আঘাতে আঘাতে সভ্যতার রূপায়ন ঘটেছে। শ্রমিক বলতে প্রথমে শিল্প শ্রমিকের ধারণা এলেও সামগ্রিকভাবে 'শ্রমিক' শব্দটির বিস্তৃতি আরও অনেক বেশি। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিবিপ্লব ও অন্যান্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধার উৎকর্ষের ফলে মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক উন্নয়ন ঘটলেও দেশের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, এখনো শ্রমিকদের তাদের ন্যায্য মজুরি, কর্মঘণ্টা ও নিরাপদ কর্মস্থলের জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুক্তবাজার অর্থনীতি ও নিয়ন্ত্রণহীন দ্রব্যমূল্যের কারণে স্বল্প ও সীমিত আয়ের মানুষদের পরিবার-পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপ্রতিষ্ঠানিক খাতের বেশির

ভাগ শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা নেই। ২০২৪ সালে আমাদের জন্য একটা নতুন সুযোগ ও একটি নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আশা করি, এই নতুন সময়ে, আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী শ্রমিকদের স্বীকৃত অধিকারসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে। উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশের শ্রমিকরাও যেন তাদের শ্রম ও আত্মমর্যাদার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শ্রমিকরাও যেন মনে করতে পারে, 'আমি/আমরাই এ দেশের উন্নয়নের কারিগর, আমার শ্রম ও ঘামেই দেশ এগিয়ে চলেছে'।

২০২৪ সালে দেশ এবং প্রবাসে বিভিন্ন খাতে নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষের কাজ, শিল্প ও শ্রম পরিস্থিতি, আন্দোলন, দাবি, নিয়ে দেশের ১৭টি জাতীয় সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে পর্যালোচনা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

শত শত কারখানা বন্ধ, লাখো কর্মী ছাঁটাই

এ মুহূর্তে সংকটে দেশের তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল ও নিট পোশাক খাত। শিল্প মালিকরা বলছেন, জ্বালানির সংকট, শ্রমিক অসন্তোষ ও ব্যাংক খাতের অস্থিতিশীলতা এই খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এতে গত এক বছরে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার ও টেক্সটাইল শিল্পের ১৪০টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাতে ৭৬টি কারখানায় কাজ করা ৫১ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতন দিতে পারছে না অন্তত ১৫৮টি কারখানা। নিট খাতে ৫০টি কারখানায় ৩৫ হাজারের বেশি শ্রমিক বেকার হয়ে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। এক বছরে ১৪০টি কারখানার মোট ৯৪ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন।

বেক্সিমকো গ্রুপ তাদের ১৫টি পোশাক কারখানার প্রায় ৪০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে। সব মিলিয়ে বন্ধ ১৫৫ কারখানায় এক লাখ ৩৪ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ১৮ দফা

দাবিতে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ

ঐকমত্য: অস্থিরতার কারণে ক্ষতি ৪০০ মিলিয়ন ডলার

দেশে চলমান শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গার্মেন্টস মালিক ও শ্রমিকপক্ষের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ বৈঠকে শ্রমিকদের নিম্নোক্ত ১৮টি দাবি মেনে নিয়েছে মালিকপক্ষ। দাবিগুলো হলো- টিফিন বিল প্রদান, ১০ অক্টোবরের মধ্যে সব কারখানায় ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন, শ্রমঘন এলাকায় টিসিবি ও ওএমএসের মাধ্যমে রেশন প্রদান, শ্রমিকদের আগের বকেয়া ১০ অক্টোবর ২০২৪ এর মধ্যে পরিশোধ, কারখানায় শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্ত করা বন্ধ করতে মনিটরিং, বাট ব্যবসা মনিটরিং করে শ্রমিকদের মধ্যে থেকে ক্রেতা বের করার উপায় বের করা, গত বছর ন্যূনতম মজুরি আন্দোলনসহ নানা সময় মামলা ও শ্রমিকদের নিপীড়ন

মামলা প্রত্যাহারের জন্য রিভিউ করে আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমাধান করা, নিয়োগে ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা, জুলাই আন্দোলনে নিহতদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, রানাপ্লাজা ও তাজরিন ফ্যাশনের বিষয়ে কমিটি গঠন, সব কারখানায় ডে-কেয়ার সেন্টার নিশ্চিত করা, অন্যায়ভাবে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা, নারীকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২০ দিন করা, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে তিন সদস্যের কমিটি গঠন, শ্রম আইন সংশোধন নিয়ে কাজ করা, প্রভিডেন্ট ফান্ড পর্যালোচনা করে শ্রমিক মালিকের আলোচনার মাধ্যমে চালু করা এবং প্রতি বছর দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট বিষয়ে কমিটি গঠন।

বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.), শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ও শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব এ এইচ এম সফিউজ্জামান।

বিগত দুই মাসে গার্মেন্টসখাতে শ্রম অস্থিরতার কারণে আনুমানিক ৩০০-৪০০ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম।

প্রযুক্তির প্রভাবে পোশাক খাতে কমছে নারী শ্রমিক

দেশের তৈরি পোশাক খাতে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে কমছে। স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি গ্রহণ ও অন্যান্য খাতের তুলনায় সুযোগ-সুবিধা কম থাকায় এই খাতে তরুণ প্রজন্মের আগ্রহও কমে গেছে। ‘বাংলাদেশে আরএমজি শিল্পের প্রযুক্তির আপগ্রেডেশন’ শীর্ষক এক সমীক্ষায় জানা যায়, ২০২৩ সালে এ খাতে নারী শ্রমিক ৫৩ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ২০১৪ সালে ৫৬ শতাংশ ছিল। দেশে পোশাকশিল্পের শুরুতে নারী পোশাক শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৮০ শতাংশের বেশি এবং এই ধারা বহু বছর

ধরে অব্যাহত ছিল। এখন নারী শ্রমিকের সংখ্যা কেবল কাপড় সেলাই এর ক্ষেত্রে নয়, মেশিন অপারেটর ও হেল্পার নারীদের সংখ্যাও কমেছে।

এছাড়া গত ১০ বছরে তৈরি পোশাক খাতের বেশির ভাগ উপ-খাতেও নারীর অংশগ্রহণ কমেছে। এ খাতের আটটি উপ-খাতের মধ্যে ছয়টিতে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে; বেড়েছে মাত্র দুটোতে। নারী শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে যে আরেকটি পরিবর্তন গত ১০ বছরে হয়েছে, তা হলো উৎপাদনখাতে প্রযুক্তি জানা মানুষের কর্মসংস্থান বেড়েছে। কিন্তু প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়লেও বাংলাদেশের উৎপাদন খাতে ১৮ লাখ কর্মীর কাজ চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কেবল তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে ১০ লাখ মানুষের কাজ চলে যেতে পারে। এজন্যে নারীরা কোথায় কোথায় প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে সমস্যার মুখে পড়ছেন, তা চিহ্নিত করে তাদের নতুন দক্ষতা শেখানো দরকার। তাহলে নারীদের এই ঝরে পড়ার হার রোধ করা সম্ভব হবে।

বিসিকের চার অঞ্চল: নারীর কর্মসংস্থানে এগিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম, পিছিয়ে রাজশাহী-খুলনা

সারা দেশে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) ৮২টি শিল্পনগরীতে ১২ হাজার ৩৬০টি প্লট রয়েছে। এর মধ্যে বরাদ্দকৃত ১১ হাজার ২৭১টি প্লটের বিপরীতে শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৬ হাজার ২০০। এর মধ্যে উৎপাদনে রয়েছে ৪ হাজার ৭০৪টি শিল্প ইউনিট। ১ হাজার ৮৯টি প্লট বরাদ্দের বাইরে রয়েছে।

চারটি অঞ্চলের অধীন ৮২টি শিল্পনগরীতে প্রায় ৬ লাখ ২৯ হাজার ৭৭৬ শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন, যেখানে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। তবে নারীর কর্মসংস্থানে এগিয়ে রয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চল। ঢাকা অঞ্চলে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৪১৫ শ্রমিকের। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১ লাখ ৯০ হাজার ৯৬৯ এবং নারীর সংখ্যা ১ লাখ ৯২ হাজার

৪৪৬জন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মরত রয়েছেন ১ লাখ ৬৮ হাজার ৪৪৯ শ্রমিক। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৭৬ হাজার ৬৫২ ও নারীর সংখ্যা ৯১ হাজার ৭৯৭জন। রাজশাহী অঞ্চলে কর্মসংস্থান হয়েছে ৪৫ হাজার ৭১০ শ্রমিকের। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩০ হাজার ৮৭২ এবং নারীর সংখ্যা ১৪ হাজার ৮৩৮। খুলনা অঞ্চলে কর্মরত রয়েছেন ৩২ হাজার ২০২ শ্রমিক। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২৩ হাজার ৬০৪ এবং নারীর সংখ্যা ৮ হাজার ৫৯৮জন।

রানা প্লাজা ধসের ১১ বছরেও শেষ হয়নি ০৩ (তিন) মামলার বিচার

কয়েকটি পোশাক কারখানা নিয়ে গড়ে ওঠা সাভারের রানা প্লাজায় ১১ বছর (২০১৩ সাল) আগে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ১ হাজার ১৩৬ জন। আহত হন প্রায় দেড় হাজার মানুষ। এত প্রাণহানির পেছনে দায় যাদের, তাদের বিচার এখনও শেষ হয়নি। মামলার বিচার কবে নাগাদ শেষ হবে তাও বলতে পারছেন না সংশ্লিষ্ট আদালতের কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য, ভবন ধসে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় ওই সময় মোট ০৪ (চার) টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মধ্যে অবহেলার কারণে মৃত্যু উল্লেখ করে হত্যা মামলা দায়ের করে পুলিশ, ইমারত নির্মাণ আইন না মেনে ভবন নির্মাণ করায় একটি মামলা করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং ভবন নির্মাণে দুর্নীতি ও সম্পদের তথ্য গোপন সংক্রান্ত দুটি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এতো ধরণের দুর্ঘটনার পরও অদ্যাবধি পোশাক কর্মীদের জন্য নিরাপদ কারখানা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। শ্রমিকরা বলছেন, ঘটনার পর বছর দুয়েক নিরাপত্তা নিয়ে কিছু কারখানা কাজ করেছে। কিন্তু এখনও কারখানায় তালা মেরে রাখা, নিম্নমানের ভবনে কারখানা, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকার মতো বিষয়গুলো বিদ্যমান রয়েছে।

বাংলাদেশ অকুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশন এর এক জরিপে দেখা যায়, ২০২৪ সালে

পোশাক শিল্পে নিহত ৫ জন ও আহত হয়েছেন ২৯ জন।

দেশের ২২৯টি পোশাক কারখানা সবুজ কারখানার বিশ্ব স্বীকৃত পেয়েছে

দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের পরিবেশ বান্ধব কারখানার সংখ্যা বর্তমানে ২২৯টি। যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি)-পরিবেশ বান্ধব সনদ দিয়ে থাকে। সনদ পাওয়ার ৯টি শর্ত পরিপালনে মোট ১১০ নম্বরের মধ্যে কোনো কারখানা ৮০-এর বেশি পেলে 'লিড প্লাটিনাম', ৬০-৭৯ পেলে 'লিড গোল্ড', ৫০-৫৯ নম্বর পেলে 'লিড সিলভার' এবং ৪০-৪৯ নম্বর পেলে 'লিড সার্টিফায়েড' সনদ প্রদান করা হয়।

সনদধারীর মধ্যে ৯১টিই লিড প্লাটিনাম, ১২৪টি গোল্ড, ১০টি সিলভার ও ৪টি কারখানা সার্টিফায়েড সনদ পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১০টি পরিবেশ বান্ধব কারখানার ৯টিই বাংলাদেশে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশ বান্ধব কারখানার স্বীকৃতি লাভ করেছে গাজীপুরের কোনাবাড়ীর এসএম সোর্সিং।

পোশাক শ্রমিকদের ৯ শতাংশ হারে বার্ষিক মজুরি বাড়বে

মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ দরকষাকষির পর পোশাক শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরির বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত তারা নিয়মিত ৫ শতাংশের সঙ্গে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ, অর্থাৎ ৯ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট পাবেন যা ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে কার্যকর হবে। উল্লেখ্য যে, শ্রমিকপক্ষ বার্ষিক ১০ শতাংশ বেতন বাড়ানোর বিষয়ে মতপ্রকাশ করেছিলেন।

গার্মেন্টস সংশ্লিষ্টরা বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রেতার রফতানি হওয়া বাংলাদেশের পোশাকের দাম কমিয়েছেন প্রায় ৫ শতাংশ। আর যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের তৈরি

পোশাকের দাম প্রায় ৮ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়েছে। খরচ বেড়ে যাওয়ায় নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন এবং ৯শতাংশ ইনক্রিমেন্ট দেওয়া তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। শ্রমিকদের বেতন দিতে গিয়েই তারা হিমশিম খাচ্ছেন। এছাড়া- জ্বালানি সংকট, শ্রমিক অসন্তোষ ও ব্যাংক খাতের অস্থিতিশীলতা, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, গ্যাস-বিদ্যুতের ঘাটতি, বিশ্বব্যাপী উচ্চ মূল্যস্ফীতিসহ বেশ কয়েকটি কারণে তৈরি পোশাক রফতানিতে ঝুঁকি বাড়ছে।



মুন্সীগঞ্জে আড়াই হাজার 'মিনি গার্মেন্টস' একটিরও নিবন্ধন নেই

ঢাকার অদূরে মুন্সীগঞ্জে বিগত কয়েক দশক ধরে গড়ে উঠেছে প্রায় আড়াই হাজার তৈরি পোশাকের ছোট কারখানা। শীত মৌসুম ও ঈদের আগে এসব কারখানা থাকে জমজমাট। এসব কারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক। তথ্যসূত্রে জানা যায়, এসব কারখানার কোনোটিরই নিবন্ধন নেই। সরকারি কোনও নীতিমালার আওতায় না থাকায় ন্যায্য-মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শ্রমিকরা। শ্রমিক মজুরির বিষয়ে জানতে চাইলে মুন্সীগঞ্জ কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক অধিদফতরের উপ-মহাপরিদর্শক জাবেদা খাতুন বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, মুন্সীগঞ্জের সদরের ২ হাজার ৫শ ক্ষুদ্র কারখানার নিবন্ধন নেই। আমরা প্রতিটি কারখানাকে নোটিশ প্রদান করবো। এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের জবাব দিতে সময় বেঁধে দেবো। বেতনের বিষয়ে মালিক-শ্রমিকদের ডেকে সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।

মজুরি কাঠামোতে থাকা ৪২টি শিল্পের মধ্যে ২১ খাতের শ্রমিকরা মাসে ৫০০০ টাকাও বেতন পান না

সরকার নির্ধারিত মজুরি কম থাকার কারণে ন্যূনতম মজুরি কাঠামোতে থাকা বর্তমানে ৪২টি শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলেও পর্যাপ্ত বেতন পাচ্ছেন না এরমধ্যে আবার ২১ খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৫ হাজার টাকার কম ও দৈনিক মজুরি ১৬৭ টাকার কম।

খাতগুলো হচ্ছে: পেট্রোল পাম্প, টাইপ ফাউন্ড্রি, আয়ুর্বেদ কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, কোল্ডস্টোর, সিনেমা হল, ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রি, হোটেল-রেস্তোরাঁ, হোমিওপ্যাথ কারখানা, রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ, মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ, স'মিলস, নির্মাণ ও কাঠ, রি-রোলিং মিলস, ট্যানারী, দর্জি কারখানা, জাহাজ ভাঙা, হোসিয়ারী, জুট প্রেস এন্ড বেলিং, ওয়েল মিলস এন্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস ও ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত অদক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক এবং কিশোর শ্রমিক।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির এই বাজারে যেখানে ১ কেজি চাল কিনতে খরচ হয় ন্যূনতম ৭০ টাকা সেখানে মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত টাইপ ফাউন্ড্রি শিল্পের একজন শ্রমিকের পুরো মাসের বেতন মাত্র ৫২১ টাকা এবং পেট্রোল পাম্প পেশার শ্রমিকের বেতন ৭৯২ টাকা। কেবল এই দুই পেশাই নয় একইভাবে আরও ১৯ টি খাতের শ্রমিকদের প্রতি মাসের বেতন ৫ হাজার টাকার কম। মজুরি বোর্ডের অজুহাত দিয়ে এসকল শ্রমিকদের দিনের পর দিন কম বেতন দিয়ে যাচ্ছেন মালিকরা। এসব খাতের শ্রমিকরা ওভারটাইম কাজ করে কোনোমতে টিকে আছেন। তারা হয়তো দেন দরবার করে ন্যূনতম মজুরির চেয়ে সামান্য বেশি মজুরি পান কিন্তু এরপরও যা পান তা দিয়ে তাদের সংসার চলে না।

উল্লেখ্য যে, সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়ের 'নিম্নতম মজুরি বোর্ড' ১৯৮৭ সালে পেট্রোল পাম্পে কাজ করা একজন শ্রমিকের প্রতিমাসে মজুরি ৭৯২ টাকা মজুরি নির্ধারণ করে দেয়। এরপর গত ৩৭ বছর পেরিয়ে গেলেও এই মজুরি বাড়ানোর কোনো

উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এছাড়া ১৯৮২ সালে মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত টাইপ ফাউন্ড্রি শিল্পের শ্রমিকদের সরকার মাসে ৫২১ টাকা মজুরি নির্ধারণ করে যা ৪২ বছর পেরিয়ে গেলেও মজুরি আর বাড়ানো হয়নি। স্বাধীনতার ৫৩ বছরেও জাতীয় মজুরি কমিশন গঠিত হয়নি।

বিশ্বজুড়ে কর্মক্ষেত্রে নারীরা এখনো নানা চ্যালেঞ্জের মুখে, বাধ্যতামূলক শ্রমের ৫৫% নারীশ্রম

বিশ্বের কোনো দেশেই পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা নারীরা পায় না। ধনী দেশের নারীরাও অনেকক্ষেত্রে সমতা থেকে বঞ্চিত। মার্চ ২০২৪ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের 'উইমেন, বিজনেস অ্যান্ড দ্য ল' শিরোনামের একটি রিপোর্টে জানা যায়, ১৯০ দেশের মধ্যে ৯৮টি দেশ নারীদের সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের আইন করেছে।

২০২৩ সালে বিশ্বের সব দেশ তিনটি ক্যাটাগরিতে সমতা আনতে প্রচেষ্টা চালায়। এগুলো হলো বেতন প্রদান, অভিভাবকের অধিকার ও কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা। প্রতিটি দেশ দুটি ক্যাটাগরিতে কম স্কোর পায়। এই দুই ক্যাটাগরি হলো শিশু লালনপালন ও নারীর নিরাপত্তা।

প্রতিবেদনে নারীর সুরক্ষার মধ্যে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের বিষয়টিও রয়েছে। বিশ্বের ১৫১টি দেশে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি নিষিদ্ধ। তবে মাত্র ৩৯টি দেশ জনসমাগমস্থলে হয়রানি নিষিদ্ধ করেছে। যেসব নারী গণপরিবহন ব্যবহার করে, কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়া করে, তাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবে খুব কমসংখ্যক দেশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২২ সালে 'হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে' একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদনে কর্মক্ষেত্রে নারীদের চ্যালেঞ্জের বিভিন্ন দিক উঠে আসে। জরিপের তথ্য থেকে জানা যায়, দেশে বেকারত্বের হার নারীদের মধ্যে ৫.৯ শতাংশ। পুরুষদের ক্ষেত্রে ২.৮ শতাংশ। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৬.৫ শতাংশ, একই বয়সী পুরুষদের চেয়ে যা দ্বিগুণ বেশি। শ্রম বাজারে নারীর

অংশগ্রহণের হার ৪৩ শতাংশ, পুরুষের ৮১ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ প্রতিবেদন ২০২৩ অনুযায়ী, মজুরিতে সমতা আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ৭২.২ শতাংশ। বৈশ্বিক তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৫৯।

অন্যদিকে, বিশ্বজুড়ে বাধ্যতামূলক শ্রম দিচ্ছে দুই কোটি ৯ লাখ মানুষ। যারা শ্রম বা যৌনশোষণের জন্য পাচার হয়েছে, কিংবা দাসের মতো পরিস্থিতিতে রয়েছে, এদের মধ্যে ৫৫ শতাংশই হচ্ছে মেয়ে বা নারী। বাকি ৪৫ শতাংশ ছেলে বা পুরুষ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও এর 'প্রফিটস অ্যান্ড পভার্টি : দ্য ইকোনমিকস অব ফোর্সড লেবার' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাধ্যতামূলক শ্রমে শিশুদের চেয়ে বয়সীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বিশ্বজুড়ে ১৮ বছরের কম বয়সী ৫৫ লাখ বা ২৬ শতাংশ শিশু বাধ্যতামূলক শ্রমে ব্যবহার হচ্ছে। এক কোটি ৫৪ লাখ বা ৭৪ শতাংশের বয়স ১৮ বা তার বেশি। বাধ্যশ্রমের এক কোটি ৮৭ লাখ বা ৯০ শতাংশ ব্যবহার হচ্ছে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক বেসরকারি খাতে। এর মধ্যে ৪৫ লাখ বা ২২ শতাংশ যৌন শোষণের শিকার। এক কোটি ৪২ লাখ বা ৬৮ শতাংশ মানুষ অন্যান্য খাতে বাধ্যতামূলক শ্রমে ব্যবহার হচ্ছে। এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে কৃষি, নির্মাণ, গৃহস্থালি কাজ, শিল্পোৎপাদন খাত, খনি এবং জন-উপযোগমূলক সেবা রয়েছে। বাকি ২২ লাখ বা ১০ শতাংশ রপ্তানিভাবে বাধ্যতামূলক শ্রম দিচ্ছে।

৮৫% অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের মর্যাদাপূর্ণ মজুরি নেই, নেই কোনো নিরাপত্তা

নিত্যপণ্যের মূল্যস্ফীতির কারণে বাজারের সঙ্গে খাপখাইয়ে জীবন নির্বাহ করতে হিমশিম খাচ্ছেন দেশের সাধারণ মানুষসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ৮৫ শতাংশ শ্রমিকগোষ্ঠী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ত্রৈ-মাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ (জুলাই-সেপ্টেম্বর)-এর তথ্যানুসারে বর্তমানে দেশে যুব শ্রম-

শক্তি ২ কোটি ৪০ লাখ ২০ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ১ কোটি ১৭ লাখ ৫০ হাজার, আর নারী ১ কোটি ২২ লাখ ৭০ হাজার। দেশে পুরুষ বেকারের সংখ্যা ১৭ লাখ ৯০ হাজার, আর নারী বেকার ৮ লাখ ৭০ হাজার।

বিক্রয়কর্মীদের অবহেলিত জীবন, নজর দেয়া জরুরি

সরকারি-বেসরকারি প্রায় সব সেক্টরেই কম-বেশি মজুরি বৈষম্য বিরাজমান। একই সরকারি প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন বা তাদের মজুরি যেভাবে নির্ধারিত হয়, ওই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারিত হয় অন্যভাবে। বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ মতে, কর্মক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেন বিক্রয় ও সেবাকর্মী, কারখানা ও মেশিন চালনাকারী ও সংযোজনকারীরা। প্রতি সপ্তাহে এ কর্মীরা গড়ে ৫৪ ঘণ্টা কাজ করেন। এক্ষেত্রে পুরুষ কর্মীদের গড় সময় দিতে হয় ৫২ ঘণ্টা, নারীকর্মীরা সময় দেন ৪২ ঘণ্টা।

কোম্পানি/ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মীদের মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়িক মুনাফা বৃদ্ধি করলেও বিক্রয়কর্মীদের অবস্থার কোনও উন্নতি নেই। কোম্পানি/ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের উচিত যারা কোম্পানির সাফল্যের মূলে কাজ করে সেই বিক্রয়কর্মীদের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হওয়া, তাদের কাজের সময়সীমা নির্ধারণ, প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সচেতন থাকা এবং ন্যায্য বেতন প্রদান করা।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সর্বশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের শ্রমিকদের শ্রম দিতে হয় বেশি কিন্তু মজুরি পায় কম। বিশেষ করে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে নির্ধারিত কর্মঘণ্টা ৮ ঘণ্টারও বেশি কাজ করতে হয় শ্রমিকদের। এ খাতের শ্রমিকদের ওভারটাইমসহ দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, যা বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে বেশি। অথচ শ্রমিকরা যে হারে শ্রম দেন সে হারে মজুরি পান না।

পাথর ভাঙার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর এলাকার দুই কিলোমিটার জুড়ে মেশিনে প্রতিনিয়ত চলে পাথর ভাঙার কাজ। এসব গুঁড়া পাথর প্রায় তিন শতাধিক ট্রাকে বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। মেশিনে উৎপাদিত পাথরের গুঁড়া আর বালুকণায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে গোটা এলাকা। এতে এলাকার নারী-শিশুসহ পাঁচ হাজারের বেশি শ্রমিক মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে এখানে কাজ করেন। দীর্ঘদিন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করার ফলে এসব শ্রমিকদের শরীরে বাসা বাঁধে নানা রোগ। অনেকে জটিল সিলিকোসিস ও হৃদরোগে আক্রান্ত হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান পাথরের স্তূপে। এছাড়া হুমকির মুখে প্রকৃতি ও পরিবেশ, নষ্ট হচ্ছে ফসলের ক্ষেত, ফল-ফুলের মুকুল। শ্রমিকদের পাশাপাশি স্থানীয়রা আক্রান্ত হচ্ছেন জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্টসহ মরণব্যাদি সিলিকোসিসে। শ্রমিকদের মাস্ক ব্যবহার করার উপায় নেই। কারণ মাস্ক পরলে তাতে ধূলা জমে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এই এলাকায় ‘স্টোন ক্রাশিং জোন’ করার দাবি দীর্ঘদিন থেকেই উপেক্ষিত। শ্রমিকদের ন্যূনতম স্বাস্থ্য সচেতনতায় কারও কোনো উদ্যোগ নেই।

এ বিষয়ে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের মেডিসিন ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এস এম মাহবুব উল আলম বলেন, সিলিকোসিস রোগ হয় মূলত বালু ও পাথরের ধূলিকণা থেকে। এই রোগের উপসর্গ বৃকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, জ্বর, মাথা ঘোরা। রোগীর শরীর নীলাভ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তেঁতুলিয়ার বাংলাবান্ধা ইউপি চেয়ারম্যান কুদরত-ই-খোদা মিলন বলেন, পাথর ভাঙার ফলে এলাকার প্রতিটি বাড়িতে ধুলার স্তূপ হয়। গাছে ফল ধরে না। তেঁতুলিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফজলে রাব্বী বলেন, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ মেশিন মালিক ও শ্রমিকদের সতর্ক করেছে। স্থলবন্দরের আশপাশে কোনো স্টোন ক্রাশিং

জোন করা যায় কিনা, এ নিয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শিশুশ্রম চালু রেখে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়

শিশুশ্রম জাতির জন্য একটি বড় অভিশাপ। কিন্তু দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসচেতনতা, আইন প্রয়োগের দুর্বলতা শিশুদের শ্রমের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আবার শিশুদের সস্তা শ্রমের জন্য কতিপয় অসাধু ব্যক্তি নানারকম প্রলোভনে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে টেনে আনে। যদিও আইন ও নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নে এটা বন্ধ করা অনেকাংশে সম্ভব।

এসডিজি’র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে সকল ধরনের শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে ইতোমধ্যে ‘জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০’ ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ’ কাজ করছে।

দেশের ৫টি সেক্টরে নিয়োজিত শিশুদের কাজের প্রকৃতি এবং সেক্টরগুলোর শ্রমজীবী শিশুদের জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন- পারিবারিক বৈশিষ্ট্য, আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ‘সেক্টরভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিশুশ্রম জরিপ ২০২৩’ পরিচালনা করেছে। বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ৪৩টি সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই জরিপের মাধ্যমে একটি শ্রমজীবী শিশু ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরগুলোতে কাজ করার সময় কী কী ধরনের বিপজ্জনক কাজ করতে পারে তা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

৫টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরের মধ্যে রয়েছে ১, মাছ, কাঁকড়া, শামুক-বিনুক সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ (শুটকি মাছ উৎপাদন), ২, পাদুকা উৎপাদন (চামড়ার তৈরি পাদুকাশিল্প), ৩, লোহা ও ইস্পাত ঢালাই (ওয়েল্ডিং কাজ বা গ্যাস বার্নার মেকানিকের কাজ) ৪, মোটর যানবাহনের

রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত (অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ) এবং ৫, ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রীর মেরামত। (অনানুষ্ঠানিক এবং স্থানীয় টেইলারিং এবং পোশাক সেক্টর) জরিপটি পরিচালনা করা হয়েছে।

জরিপের তথ্যমতে, দেশের ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুরা বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ খাতে কাজ করছেন। ৫টি খাতে ৩৮ হাজার ৮ জন শিশু কাজ করছে, যার ৯৭ দশমিক ৫ শতাংশই ছেলে শিশু। সবচেয়ে বেশি কাজ করে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে।

জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, ৪০ হাজার ৫২৫টি প্রতিষ্ঠান এবং ৩৮ হাজার ৮ জন ৫-১৭ বছর বয়সী শিশু এই ৫ ঝুঁকিপূর্ণ খাতে কর্মরত আছে। ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে কাজে নিয়োজিত শিশুদের মধ্যে ৯৭ দশমিক ৫ শতাংশ ছেলে এবং ২ দশমিক ৫ শতাংশ মেয়েশিশু।

উপরিউক্ত ৫টি সেক্টরে শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা হলো যথাক্রমে স্ট্রিক মাছ উৎপাদনে ৮৯৮, চামড়ার তৈরি পাদুকা তৈরিতে ৫ হাজার ২৮১, ওয়েল্ডিং বা গ্যাস বার্নার মেকানিকের কাজে ৪ হাজার ৯৯, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে ২৪ হাজার ৯২৩ এবং অনানুষ্ঠানিক এবং স্থানীয় টেইলারিং বা পোশাক খাতে ২ হাজার ৮০৫ জন। তথ্যানুযায়ী, শ্রমজীবী শিশুদের সবচেয়ে বড় অংশ নিয়োজিত রয়েছে অটোমোবাইল খাতে। গ্রাম ও শহর বিবেচনায় এই খাতে কর্মরত শিশুর ৩৫ দশমিক ৭ শতাংশ পল্লী এবং ৬৪ দশমিক ৩ শতাংশ শহর এলাকায় বসবাস করে।

আনুমানিক ১৯ দশমিক ১ শতাংশ ছেলে এবং ৭ দশমিক ৭ শতাংশ মেয়েশিশু ভারী বোঝা বহন, মালামাল টানার কাজে, অধিক ওপরে বা ফ্লোর থেকে অতি উচ্চতায় উঠে কাজ করে প্রায় ৮ দশমিক ১ শতাংশ ছেলে এবং শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ মেয়েশিশু। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) পরিচালিত ‘হিডেন স্লেভারি: চাইল্ড ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স’ শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা গেছে, শিশু গৃহকর্মীদের ৮৩ শতাংশই মেয়েশিশু। আর এদের প্রায় ৬০ শতাংশ

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার। শ্রম সংস্কার কমিশনের সভাপতি সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন প্ল্যাটফর্ম (সিএলইপি) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে বিগত সরকারের আমলে তিন দফায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কিন্তু জরিপে দেখা যাচ্ছে, দেশে শিশুশ্রম বেড়েছে। যদিও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম কমেছে। কিন্তু সেটা শিশুর সংজ্ঞার পার্থক্যের কারণে। তাহলে প্রকল্পের টাকা কীভাবে খরচ হয়েছে এবং কী কাজ হয়েছে তা জনসমক্ষে স্বেতপত্র আকারে প্রকাশ করা দরকার। এছাড়া শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য সরকারকে প্রশাসনিক নির্দেশ দেয়ার পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

১২ দাবিতে নির্মাণ শ্রমিকদের মানববন্ধন

ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব) মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ ১২ দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে। মানব-বন্ধনে তারা বলেন, ‘নির্মাণ শিল্পে প্রায় ৩৫ লাখ শ্রমিক কর্মরত আছে। বিদেশেও কর্মরত আছে কয়েক লাখ নির্মাণ শ্রমিক। এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কাজ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কর্মস্থলে প্রাণ-হানির ঘটনা প্রায়ই ঘটে।’ এ শিল্পের শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইনসাবের দাবিগুলো হলো-

১. সরকারি উদ্যোগে রাজধানীসহ সারা দেশে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য কলোনি স্থাপন করে শ্রমিকদের বাসস্থান নিশ্চিত করা;
২. কলোনিতে শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৩. বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভা প্রতি মাসে একবার করতে হবে। তহবিল থেকে

নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য ব্যাপক কল্যাণমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৪. শ্রম আইনের আওতায় নির্মাণ শ্রমিকদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা;
৫. রেশনিং ব্যবস্থা, দুর্ঘটনায় নিহত এবং আহত বা আজীবন পঙ্গুত্ব বরণকারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুযায়ী এক জীবনের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা;
৬. নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের অধিকার বাস্তবায়নে যাতে সহজে আদালতে যেতে পারে, সে লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলা-উপজেলায় শ্রম আদালত স্থাপন করতে হবে এবং অধিকার ও পাওনার বিষয়ে ৪২ দিনের মধ্যে বিচারকাজ সম্পন্ন করা;
৭. ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ এবং নির্মাণশ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
৮. শ্রম আইন সংশোধনী ২০০৬ এর ৩২৩ ধারা অনুযায়ী জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য কাউন্সিলে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশে (ইনসাব) প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা;
৯. কর্মস্থলে নির্মাণ শ্রমিকরা যাতে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও সহিংসতার শিকার না হয় তা নিশ্চিত করা;
১০. সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে শুধু সার্ভিস চার্জ নিয়ে নির্মাণশ্রমিকদের প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দিয়ে বিদেশে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং বর্তমানে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের হয়রানি ও দুর্ভোগ বন্ধ করা; সরকারি উদ্যোগে বিভাগীয় শহরে থানা ভিত্তিক এবং জেলা ও উপজেলায় শ্রম ছাউনি নির্মাণ করা;
১১. নারী নির্মাণ শ্রমিকদের সমকাজে সম-মজুরি নিশ্চিত করা;
১২. নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য রেজিস্টার খাতা রাখার বিধান সব নির্মাণাধীন ভবনে বাস্তবায়ন করা এবং নির্মাণ শ্রমিকদের সরকার ঘোষিত মজুরি কার্যকর করা।

উল্লেখ যে, বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশন এর প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে নির্মাণ খাতে ৬২ জন শ্রমিক নিহত ও আহত হয়েছেন ৫ জন শ্রমিক।

গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন জরুরি

বাংলাদেশে ২৫ লক্ষাধিক মানুষ গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োজিত আছেন, যাদের ৯০ শতাংশ নারী। অনানুষ্ঠানিক খাতের এই বিশাল কর্মীরা জাতীয় অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখলেও, ‘শ্রমিক’ হিসেবে তারা বাংলাদেশ শ্রম আইনে এখনো অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি। ফলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। ২০২২ সালে অক্সফ্যামের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানা যায়, নারী সদস্যদের প্রায় ৯৩ শতাংশ তাদের কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হন। গৃহকর্মীদের ৬৭ শতাংশ মানসিক নির্যাতন, ৬১ শতাংশ মৌখিক নির্যাতন এবং ২১ শতাংশ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। সাম্প্রতিক গৃহশ্রমের বিভিন্ন ঘটনা প্রমাণ করে আমরা কতটা অমানবিক হয়ে উঠেছি।

গৃহশ্রম ও দারিদ্রের মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। জীবন-জীবিকার সংগ্রামে গৃহে শিশুশ্রমের পরিমাণ বাড়ছে। গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুরা সামর্থ্যের বাইরে শ্রম, নিম্নমানের পরিবেশে থাকা, পুষ্টিকর খাবার ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া, নিয়োগকারীর সঙ্গে ৯৯ শতাংশের বেশি কোনো লিখিত চুক্তি না থাকা এমনকি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হতে বাধ্য হচ্ছে। পাশাপাশি, নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়ে অত্যন্ত অমানবিক জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে।

বিগত সরকার গৃহশ্রমিকদের জন্য ‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫’ প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালায় ছুটি, বিনোদন, পারিশ্রমিক, কর্মঘণ্টা, চিকিৎসা ও পড়াশুনার কথা উল্লেখ থাকলেও, তার কোনোটিই তারা পাচ্ছে না। গৃহশ্রমিকদের এসব অধিকার নীতিমালা হয়েই রয়ে গেছে, বাস্তবায়ন

হচ্ছে না। সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে নিম্নমানের আবাসনে রেখে, নির্যাতিত রেখে, অরুচিকর, উচ্ছিষ্ট খাদ্য দিয়ে, মানহীন শিক্ষায়, স্বাস্থ্য ও পরিবেশে বেড়ে উঠতে দিয়ে অপরাধহীন সভ্য ও মানবিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন কখনোই সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশন এর প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে গৃহস্থালি কাজে ৫ জন শ্রমিক নিহত ও ১ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

গুটিকি মৌসুম শেষে ঘরে ফিরছেন জেলেরা, নিয়ম উপেক্ষা করে অতিরিক্ত রাজস্ব-আদায় করার অভিযোগ জেলেদের

প্রতি বৎসর ৩ নভেম্বর থেকে বঙ্গোপসাগরের সৈকতঘেঁষা কুঙ্গা নদীর পূর্ব পাড়ের সুন্দরবনের দুবলার চরে গুটিকির মৌসুম শুরু হয়। গুটিকির মৌসুম চলে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। প্রতি বছর খুলনা অঞ্চলের জেলেরা সেখানে গিয়ে বঙ্গোপসাগর থেকে নানা প্রজাতির মাছ আহরণ করেন। সেই মাছ চরের রোদে গুটিকি করে তারা বাজারজাত করেন। টানা পাঁচ মাস ধরে সেখানকার চরে থেকে কাজ করেছেন অন্তত ১৫ হাজার জেলে।

সাগরপাড়ের চরে জেলেদের অস্থায়ী কাঁচা ঘরে থাকতে হয়। জ্বালানি, মাছ শুকানোর চাতাল, মাচাসহ সব ধরনের কাজে সুন্দরবনের কোনও গাছপালা ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় চরে যাওয়া জেলেরা সঙ্গেই নিয়ে যান প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী। জেলেদের থাকা ও গুটিকি সংরক্ষণের জন্য বন বিভাগের অনুমতি নিয়ে দেড় হাজার ঘর, ৬৩টি ডিপো এবং শতাধিক দোকান স্থাপন করা হয়।

জেলেদের মতে, সরকারিভাবে চার-পাঁচ হাজার টাকা রাজস্ব নেওয়ার কথা থাকলেও তাদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে ১৮ হাজার টাকা। অথচ বাড়তি টাকা আদায়ের কোনো রসিদ দেওয়া হয়নি। বন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে নিম্ন-শ্রেণির সব কর্মকর্তা-কর্মচারী আনুপাতিক হারে ওই ভাগ করে নিচ্ছেন।

জেলেরা জানান, ‘আর্থিক দুরবস্থা, উন্নত প্রযুক্তির সংকট রয়েছে। এর মধ্যেও তারা সমুদ্রে গিয়েছেন। নৌকা, জাল, খাবার, পানি সব কিছু মিলিয়ে ১৫ লাখ টাকা খরচ হয়, যা দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সুদে নিতে হয়। ১০ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে বছরে ১৩ লাখ টাকা দিতে হয়। সাগরপাড়ের চরগুলোতে গুটিকির কাজ চলাকালে তারা পানি সঙ্কট ও চিকিৎসা সঙ্কটে থাকেন।

নিষেধাজ্ঞা চলমান থাকাকালীন বরাদ্দকৃত চাল পাননি অনেক জেলে

যে জেলেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, ঝড়-তুফান ও বৈরি আবহাওয়া উপেক্ষা করে সমুদ্রে মাছ ধরে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের আমিষের যোগান দেয়, সেই জেলেদের জীবন কীভাবে কাটে, সেটি আমাদের নীতিনির্ধারকগণ খুব গুরুত্বের সঙ্গে ভাবেন বলে মনে হয় না। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন কয়েকগুণ বাড়লেও জেলেদের জীবনমানের কোনো উন্নতি হয়নি। সামগ্রিকভাবে জেলেরা বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা সমুদ্রে মাছ ধরেন, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। অনেকের স্থায়ী ঘরবাড়িও নেই। কোনোভাবে অন্যের জায়গায় মাথা গোঁজার ঠাই করে নেন।

দেশে মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময় মোট ০৩ (তিন) বার। অক্টোবর-নভেম্বর ২২ দিন মা ইলিশ রক্ষা করার জন্য, মার্চ-এপ্রিল ২মাস ইলিশের অভয়ারণ্য হিসেবে চিহ্নিত ৬টি এলাকায় জাটকা বড় হতে দেওয়ার জন্য এবং মে-জুলাই ৬৫দিন সাগরে প্রাকৃতিকভাবে মাছের জোগান বাড়ানোর জন্য।

এ ছাড়া নভেম্বর-জুন ৮ মাস ইলিশের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জাটকা ধরা, বহন করা, বাজারজাতকরণ ও বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অর্থাৎ এই ৮মাস পরই ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১৪৭ দিনই মাছ ধরা নিষেধ, একটা বছরের প্রায় ৪০ ভাগ সময় একজন জেলে মাছ ধরতে পারবেন না। মাছ ধরা নিষিদ্ধের দুটি সময়ে সরকারি

তরফে জেলেদের জন্য শুধু চাল বরাদ্দ দেওয়া আছে। কিন্তু শুধু চালে একজন জেলে তাঁর জাল গুছিয়ে রাখার পর নিজের জীবন ও পরিবার চালাতে পারেন কি না ভেবে দেখা দরকার। আবার সব জেলেই কি চাল পান?

২০২৪ সালে কোস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত এক তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, ভোলা, কক্সবাজার, বরগুনা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, লক্ষীপুর ও নোয়াখালী এই ৭ জেলায় নিবন্ধিত জেলে আছেন ৮ লাখের ওপরে, কিন্তু জেলে কার্ড আছে ৭ লাখ জেলের। নারী জেলেরা এ ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে, খুব কম নারী জেলের কার্ড আছে। এছাড়া স্থানীয় প্রভাবশালীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা অনেকেই আছেন তারা জেলে নন, কিন্তু জেলে কার্ডধারী। সব মিলিয়ে এক চরম বঞ্চনার শিকার জেলেরা।

এছাড়া আছে সারা বছরব্যাপী পুলিশি হয়রানি, যেখানে জেলেদের জীবন পর্যন্ত চলে যায়। চাঁদপুরের জেলেরা জানিয়েছেন, তাঁদের সারা বছরব্যাপী পুলিশকে চাঁদা দিয়ে নদীতে জাল ফেলতে হয়। প্রকাশিত তথ্যে আরও জানা যায়, সারা বছর নিম্ন আয় করা জেলেদের প্রায় ৬০ ভাগ নিষিদ্ধের সময়ে প্রায় কিছুই আয় করেন না, ঋণের দায় তখন এতই বেড়ে যায় যে, একজন জেলের তাঁর আয়-উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলাফল হিসেবে মানসিক চাপ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে যায়।

সব মতস্যজীবীর জীবনমান উন্নয়নে শুধু খাদ্য সহায়তা নয়, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। জেলেরা যাতে মহাজনদের ঋণচক্রে আবদ্ধ না হয়ে পড়েন সে জন্য তাঁদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। উপকূল ও চরাঞ্চলের অনেক স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অভিভাবকেরা সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারেন না।

মাছ ধরা বন্ধ থাকার সময়ে জেলেদের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত পাশাপাশি নদী ও মৎস্য ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদি

উন্নয়নের জন্য জেলেদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার। কেননা এ সংক্রান্ত যেকোনো আইন ও নীতির প্রথম প্রভাব পড়ে জেলেদের ওপর। নিপীড়নের জালে জড়িয়ে থাকা এই জেলেদের সত্যিকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও ঐক্য দরকার।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশন এর প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে মতস্য খাতে ২৫ জন জেলে নিহত ও আহত হয়েছেন ১০ জন।

২২৭৩টি কারখানা অগ্নিদুর্ঘটনার ঝুঁকিতে রয়েছে

দেশে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সরকার ও সংশ্লিষ্ট নজরদারি কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ। তাৎক্ষণিকভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি তদন্ত শেষে জমা পড়ে কিছু সুপারিশ। এ ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের পূর্বের তালিকা ধরে চলে বিশ্লেষণ। তালিকা পর্যালোচনা করে শুরু করা হয় হালনাগাদের কাজ। কিন্তু কিছুদিন পরই তা অদৃশ্য কারণে থেমে যায়। ‘সরকারের উচ্চপর্যায় কে বারবার বলা হলেও মানা হয় না প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। মুনাফালোভী অপরাধীরা মানুষের জীবনের পরোয়া না করেই নিজেদের বাণিজ্য চালিয়ে যায়। দেশের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও কলকারখানা গড়ে উঠেছে। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দুটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকাসহ সারা দেশে ছোট-বড় মিলিয়ে ২২৭৩টি কারখানা অগ্নিদুর্ঘটনার ঝুঁকিতে রয়েছে। ওইসব কারখানায় নেই নিরাপত্তার বলাই।

কোনো আইনেরই তোয়াক্কা করছে না এসব কারখানা কর্তৃপক্ষ। ভবনগুলোতে নেই বিকল্প সিঁড়ি ও সঠিক নজরদারি। যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শ্বাসকষ্টে ২৫% পোশাক শ্রমিক

পোশাকশ্রমিকদের জীবনে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত বিষয়ের প্রভাব নিরূপণ এবং ট্রেড ইউনিয়নের করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্‌স) এক গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় সরকার, মালিকপক্ষ, ট্রেড ইউনিয়ন ও তৈরি পোশাক শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেন। টঙ্গী ও গাজীপুরের ১৬০টি কারখানার ৪০২ জন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, পূর্বের তুলনায় পানি ও বায়ুদূষণ বেড়ে যাওয়ায় মাথাব্যথা, মাথাঘোরার মতো নানা স্বাস্থ্যগত জটিলতা বেড়েছে শ্রমিকদের। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের ২১ ভাগের মাথাব্যথা, ১৪ ভাগের মাথাঘোরা, ২০ ভাগের ক্লান্তি এবং ২৫ ভাগের শ্বাসকষ্ট আগের চেয়ে বেড়েছে। পোশাক শ্রমিকদের ৯৯ভাগই দেশের দূরবর্তী এলাকা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে কারখানাগুলোয় শ্রমিকদের ছুটি বা অনুপস্থিতি বেড়েছে ২৩ শতাংশ। ৮শতাংশের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও ৬শতাংশের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমেছে এবং ১৩ শতাংশের ক্ষেত্রে আয় হ্রাস ও চাকরির নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে।

৬০ শতাংশ শ্রমিকের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তৈরি পোশাক কারখানার ভেতরে তাপমাত্রা বেড়েছে। এ কারণে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সমস্যা, নতুন রোগ, ছুটি বা অনুপস্থিতি, কম উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থানের নিরাপত্তাহীনতা, সহিংসতা এবং আয় হ্রাসের মতো বিষয়গুলো সামনে আসছে। ৬০ শতাংশ শ্রমিক কারখানায় পানি দূষণ, ৪১ শতাংশ বায়ুদূষণ এবং প্রায় ৪৩ শতাংশ শব্দদূষণের কথা জানিয়েছেন তারা। ৬৫ শতাংশ শ্রমিক উল্লেখ করেছেন, কারখানার তরল আবর্জনা স্থানীয় ডেনে ফেলা হয়, ৮শতাংশ বলেছেন, ট্রিটমেন্ট

প্লাস্ট ও নদী-নালা-পুকুরে ফেলা হয়। ৫৫ শতাংশ জানিয়েছেন, তাদের আবাসিক এলাকায় পরিবেশগত সমস্যাগুলো অমীমাংসিত থাকে। ২২ শতাংশের মতে, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সমস্যার সমাধান হয়। ৫৪ শতাংশ বলেছেন, পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় ট্রেড ইউনিয়নের নীতিগত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

গবেষক মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয়ার ফলে উৎপাদনশীলতায় এর প্রভাব পড়ছে। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি রাসায়নিক দ্রব্যের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। রাসায়নিক দ্রব্য কোনোভাবেই ড্রেনে ফেলা যাবে না। একই সঙ্গে শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সুপেয় পানি ও নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।’

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর প্রতিবেদনে জানা যায়, বৈশ্বিক শ্রমশক্তির ৭০ শতাংশের বেশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকির পাশাপাশি মানসিক সমস্যাও তৈরি হচ্ছে। ‘জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা’ শীর্ষক এক প্রতিবেদনে জানা যায়, বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলেই জলবায়ু পরিবর্তন কর্মীদের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুতর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আইএলওর হিসাব অনুযায়ী বৈশ্বিক ৩৪০ কোটি শ্রমশক্তির মধ্যে ২৪০ কোটির বেশি কর্মক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে তাপপ্রবাহের ঝুঁকিতে রয়েছে। জরিপে দেখা যায়, ২০২০ সালে যা ছিল ৬৫.৫ শতাংশ, বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৭০.৯ শতাংশ। দুই কোটি ২৮ লাখ ৭০ হাজার পেশাগত দুর্ঘটনার কারণে ১৮ হাজার ৯৭০ শ্রমিকের প্রাণহানি ও ২০ লাখ ৯০ হাজার শ্রমিকের অক্ষমতার ঘটনা ঘটেছে, যার প্রধান কারণ ছিল মাত্রাতিরিক্ত তাপপ্রবাহ।

কৃষি খাতে কীটনাশকের ঝুঁকিতে রয়েছে ৮৭ কোটির বেশি কর্মী। এতে দেখা যায়,

কীটনাশকের বিষে বছরে তিন লাখের বেশি শ্রমিকের মৃত্যু ঘটছে। এ ছাড়া বছরে জীবাণুবাহিত ও সংক্রামক ব্যাধির কারণে ১৫ হাজারের বেশি শ্রমিকের মৃত্যু ঘটছে।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে সুপারিশসমূহ

বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশন কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রদান করেন:

১. শ্রম আইন ও বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা;
২. শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে মালিক শ্রমিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে সেইফটি কমিটি গঠন;
৩. কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের পরিবারকে এককালীন ১০ লাখ টাকা এবং আহত শ্রমিককে ৫ লাখ টাকা সহায়তা প্রদান;
৪. সব সেক্টরে ‘সেইফটি অডিট’ চালু করা, সরকারিভাবে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যের সঠিক ডাটাবেজ তৈরি করা;
৫. সর্বজনীন পেনশন স্কিমে দুর্ঘটনায় নিহত/আহত শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা;
৬. শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করা;
৭. কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ পিপিই ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৮. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা সম্পর্কে শিল্প মালিক ও ব্যবস্থাপকদের অবহিত করা;
৯. পেশাগত ব্যাধি নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু করা;
১০. অপ্রাতিষ্ঠানিক/দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের পরিবার ও আহত শ্রমিককে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

২০২৪ এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শ্রমজীবী ১৩৩জনের মৃত্যু

কোটা সংস্কার আন্দোলন দিয়ে শুরু হওয়া চব্বিশের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান চলাকালে ১৮-২০ জুলাই ও ৪-৭ আগস্ট এই সাত দিনে ৮৫২ জন নিহত হয়েছেন। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) এর পেশাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে নিহতদের মধ্যে ৫৫৬ জনের পেশা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে শিক্ষার্থী ২৬৫ (৪৮ শতাংশ) জন, শ্রমজীবী ১৩৩ (২৪ শতাংশ) জন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ৫১ (৪ শতাংশ) জন, বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ী ৪১ (৭ শতাংশ) জন, অন্যান্য পেশায় রয়েছেন ৬৬ (১২ শতাংশ) জন। নিহতদের মধ্যে শিক্ষার্থী ও শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ৭১ শতাংশেরও বেশি।



দায়িত্ব পালনকালে সঠিক সুরক্ষা পান না পুলিশ সদস্যরা

দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ২৪ ঘণ্টা সেবা দিয়ে থাকেন। প্রতিদিন ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা তাদেরকে কাজের মধ্যেই থাকতে হয়। পুলিশের বেশিরভাগ সদস্য বাইরে ধুলাবালু, বৃষ্টি, তীব্র দাবদাহ ও শব্দকে উপেক্ষা করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাদের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, নাক ও কানের সমস্যা, হৃদরোগ, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, টিবি, কিডনি রোগ,

হার্ট অ্যাটাক, মস্তিষ্কসহ শরীরে নানারকম জটিলতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ছাড়া দায়িত্ব পালনকালে নানা রকম ঝুঁকি বিড়ম্বনায় পড়তে হয় পুলিশ সদস্যদের।

তাদের শৌচাগারের জন্যও নেই তেমন কোনও ব্যবস্থা। এতে দুর্ভোগে পড়েন বিভিন্ন সিগন্যালে দায়িত্ব পালন করা নারী ও পুরুষ সদস্যবৃন্দ। আশপাশের বিভিন্ন মার্কেট, ভবন, বাস কাউন্টার ও প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাদের শৌচাগারের কাজ সারতে হয়। ফলে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ব্যবহারের কারণে শারীরিক নানা জটিলতায় পড়েন তারা। পাশাপাশি আবাসন ব্যবস্থা, খাবারের মানসহ সবকিছুরই রয়েছে সীমাবদ্ধতা। প্রতিটি পুলিশ লাইনে আবাসনের প্রতিটি কক্ষে গাদাগাদি করে বসবাস করেন পুলিশ সদস্যরা। একটি ১২ জনের কক্ষে ৮০ থেকে ৯০ জন পর্যন্ত বসবাস করেন। পাঁচ জনের শৌচাগার ব্যবহার করেন ১৫ জন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেনিন চৌধুরী ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মেখলা সরকার বলেন, দীর্ঘ সময় খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাদের মাঝে শ্বাসকষ্ট, টিবি, কিডনি, হার্ট, কান ও মস্তিষ্কসহ শরীরে নানারকম জটিলতা দেখা দেয়। বায়ুদূষণের কারণে দীর্ঘমেয়াদি হাঁচি-কাশি হতে পারে, এজমা, বাতাসের মাধ্যমে একধরনের ভাইরাসেও ট্রাফিক পুলিশ সদস্য আক্রান্ত হতে পারে। শ্বাসতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন রোগ হতে পারে। ট্রাফিক পুলিশ প্রস্রাব দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখার কারণে তাদের প্রোস্টেটে নানা সমস্যা হতে পারে। শব্দদূষণের কারণে কানের সমস্যা হতে পারে। এজন্য তাদের রোদে গরমে দাঁড়িয়ে কাজ করলে প্রতি ৩০ মিনিট পর অন্তত: পাঁচ মিনিট ছায়া ও ঠান্ডা স্থানে বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজের চাপ কমাতে হবে।

‘দীর্ঘসময় কাজ করলে যেকোনও লোকই শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। একজন পুলিশ সদস্যের এক্ষেত্রে

আরও বেশি ঝুঁকি রয়েছে। ৮ ঘণ্টার বেশি লাগাতার কাজ করলে কোনও লোকের ব্রেনই কাজ করবে না। এ জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য তাদের ছুটি ও নির্ধারিত কর্মঘণ্টা কমানো ও পর্যন্ত ঘুমের প্রয়োজন।’

যদি আমরা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে চাই, তাহলে তাদের মস্তিষ্কের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। কিন্তু সেটারও তো বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। আট ঘণ্টা কাজ সর্বজনস্বীকৃত তাই মস্তিষ্কের সক্ষমতাও সেভাবে তৈরি থাকে। এরপর মস্তিষ্ক আর কাজ করতে চায় না। একইভাবে কাজের পরিবেশ, আবাসনব্যবস্থা সবকিছুই ব্যক্তিজীবনে প্রভাব ফেলে।

অটোরিকশা চলাচল বন্ধের প্রতিবাদে চালকদের সড়ক অবরোধ

অটোরিকশার চলাচল বন্ধের প্রতিবাদে ১৯-২০ মে ২০২৪ আগারগাঁও, মিরপুর-১, ১০ ও আশপাশের এলাকা এবং রাজধানীর রামপুরা এলাকায় অটোরিকশার চালকরা সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ তাদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে ওইসব এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ রিকশাচালকরা সড়কে বসে বিক্ষোভ করেন ও বিভিন্ন যানবাহন ভাঙচুর করেন। মিরপুরের কালশীতে ট্রাফিক পুলিশ বক্সে আগুন দেয়া হয়। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মিরপুর মডেল থানায় একটি, পল্লবী থানায় দুটি ও কাফরুল থানায় একটিসহ পৃথক চার মামলায় আসামি করা হয়েছে প্রায় ২ হাজার ৫০০ জনকে। এসব মামলায় ৪২ জনকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ‘আল্লাহ ভরসা’, ‘খোদা হাফেজ’, ‘খাজা বাবা’ কিংবা ‘বিসমিল্লাহ’- এমন হরেক নামের ব্যানারে রাজধানীর সড়কে অটোরিকশা চলতে দেখা যায়। এ ধরনের নাম ব্যবহার মূলত চাঁদাবাজির একটি কৌশল, যার নেপথ্যে থাকা ব্যক্তির সবাই স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাকর্মী। এসব

নামযুক্ত ব্যানার দেখে ট্রাফিক পুলিশ সহজেই বুঝতে পারেন কোন অটোরিকশা কোন এলাকার কোন নেতার নিয়ন্ত্রণে।

এভাবে যারা অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন সপ্তাহ শেষে তারা অটোরিকশা প্রতি ৭০০ থেকে ১ হাজার টাকা অটোরিকশা মালিক ও চালকের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে থাকেন। এসব টাকা রাজনৈতিক নেতাকর্মীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে ভাগভাটোয়ারা করে নেয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অটোরিকশার একাধিক মালিক ও চালক।

তবে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও দ্রব্যমূল্যের কথা চিন্তা করে বিগত সরকার একটি বিধিমালার মাধ্যমে এটিকে রেগুলেট (নিয়ন্ত্রণ) করার পরামর্শ প্রদান করেন। সেই রেগুলেশনের আওতায় রিকসা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, তাদের নির্দিষ্ট এলাকা ভাগ করে দিতে হবে। নির্ধারিত এলাকার বাইরে তারা গাড়ি চালাতে পারবে না। মহাসড়কে কিংবা বিজি হাব কিংবা সড়কে তারা অটোরিকশা চালাতে ও যেতে পারবেন না। উল্লেখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট আইন-বিধিমালা যথাযথভাবে সংশোধন কিংবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকার প্রধান সড়ক বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

দেশে বেসরকারি পর্যায়ে নিরাপত্তাসেবার চাহিদা বাড়লেও, বিনিময়ে নিরাপত্তা কর্মীরা পান অনেক কম মুজরি

দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের টাকা আনা-নেওয়া, বড় ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত গার্ড, বিদেশ থেকে আসা কোনো বিনিয়োগকারী বা দাতা সংস্থার নিরাপত্তা কর্মকর্তা, বাসাবাড়ি, হাসপাতাল, শিল্প-কারখানা, বিভিন্ন ডিপো, জ্বালানি খাতের সংরক্ষণাগার, শপিং মল ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীরা কাজ করছেন। দেশে প্রথম বেসরকারি নিরাপত্তাসেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৮ সাল থেকে

সিকিউরেঞ্জ প্রাইভেট লিমিটেড যাত্রা শুরু করে। তখন বিভিন্ন বাহিনীর কর্মকর্তারা চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর এই কম্পানি চালু করেন। এক মাস পর রোরা নামে আরো একটি বেসরকারি কোম্পানি এই খাতে ব্যবসা শুরু করে। ১৯৯৪ সালে তৃতীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা করে জেএসএস সার্ভিস লিমিটেড। বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে নিরাপত্তাসেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় এখন ৮০০টি। তবে এর কোনো তালিকা নেই। আর কর্মী রয়েছেন প্রায় সাত-আট লাখ। দেশে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেন বিভিন্ন ব্যাংক ও ব্যাংকের এটিএম বুথে, যার সংখ্যা প্রায় দুই লাখ ৫০ হাজার।

নিরাপত্তাসেবা দানের এই খাত মূলত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে। সেবা ও সুরক্ষা বিভাগের অধীনে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর বাইরে নিরাপত্তাসেবা দেওয়া কোম্পানিগুলো নিয়ে ২০০৪ সালে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ প্রফেশনাল সিকিউরিটি সার্ভিস প্রভাইডার অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ-সএসপিএ)। যার সদস্য ৪৪টি কোম্পানি।

নিরাপত্তাকর্মীদের বেতন দিয়ে থাকেন সাধারণত সেবা নেওয়া ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। সরকারের পক্ষ থেকে ২০০৬ সালে নিরাপত্তাসেবা নিয়ে আইন করা হয়, যা পরে সংশোধন করে ২০১৬ সালে আইন চূড়ান্ত করা হয়। আর ২০১৯ সালে শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে একটি কমিটি গঠন করে ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হয়। উক্ত ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী প্রত্যেক নিরাপত্তাকর্মীর ন্যূনতম বেতন ৯ হাজার ৮০০ টাকা। এর বাইরে কর্মী সরবরাহকারী কোম্পানিগুলোর সার্ভিস চার্জ নেওয়ার নিয়ম, যা এক হাজার থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে। এই সার্ভিস চার্জের মধ্যে নিরাপত্তাকর্মীর পোশাক, প্রশিক্ষণ, নজরদারি, চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়। তবে এই বেতন যথেষ্ট নয় বলে মনে করে সেবা দেওয়া কোম্পানিগুলো। নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কর্মরত ব্যক্তিগণ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের সম্পদ পাহারা দেন, অথচ তাদের জীবনই কাটে

অনিরাপত্তায়। নিরাপত্তা প্রহরীদের মতে, তারা বেশিরভাগই দুই শিফটে ১৬ঘন্টা কাজ করে বেতন পান ১৫/১৬ হাজার টাকা। তাদের কোনো সাপ্তাহিক ছুটি নেই। বাড়ি গেলে যে কয় দিন থাকেন, সেই কয়েক দিনের বেতন কেটে রাখা হয়। ঈদের মধ্যেও কোনো ছুটি পাওয়া যায় না। অসুস্থ হলে ডিউটি করতে না পারলে কয়েক দিনের বেতন কেটে রাখা হয়। কাজ করলে টাকা, না করলে নেই। সব প্রহরীরই একই অবস্থা।

এ বিষয়ে নিরাপত্তাসেবা দেওয়া কোম্পানি সিকিউরেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহান কুদ্দুস বলেন, ‘সরকার নির্ধারিত ৯ হাজার ৮০০ টাকা বেতন ৯০ শতাংশ কোম্পানিই দিতে চায় না। বড় বড় করপোরেট অফিস এই নিয়ম বাস্তবায়ন করতে দিচ্ছে না। আমরা আমাদের তিন হাজার টাকা সার্ভিস চার্জ ভাগ ভাগ করে দেখায় যে, এই খাতে আমাদের এই খরচ। তারপরও তারা মানতে চায় না। ফলে কম বেতনে নিরাপত্তাকর্মীদের কাজ করতে হয়।’

নানা জটিলতায় দেশের শ্রম আদালতগুলোতে প্রায় ২২ হাজার মামলা বিচারাধীন

চাকরিচ্যুতি, পাওনা, ক্ষতিপূরণ না পাওয়াসহ নানাভাবে বঞ্চিত ভুক্তভোগীরা শ্রম আইন প্রতিকার চেয়ে শ্রম আদালতে মামলা করতে পারেন। বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের ১০টি জেলায় শ্রম আদালতের সংখ্যা ৭টি বাড়িয়ে ১৪টি শ্রম আদালত করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকায় রয়েছে ৪টি (আপিল ট্রাইব্যুনালসহ)। শ্রম আইনে বলা আছে, শ্রম আদালতের রায়, সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ, প্রত্যেক ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। ৬০ দিনের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রায় দেওয়া সম্ভব না হলে উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করে আদালত সময়সীমা আরও ৯০ দিন বাড়াতে পারবেন।

শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের তথ্য অনুযায়ী, গত ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত দেশের শ্রম

আদালতগুলোতে যে ২১ হাজার ৬১৭টি মামলা ছিল, তার মধ্যে ১৬ হাজার ১৪১টি মামলা ছয় মাসের বেশি সময় অনিশ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৭৫ শতাংশ মামলাই আইনে নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি হয়নি। শ্রম আদালতে ক্ষতিপূরণ ও পাওনা আদায়ের জন্য দায়ের করা মামলার ৯০ শতাংশই পোশাক শ্রমিকদের করা।

শ্রম আদালতে মামলা ঝুলে থাকার কারণ বিষয়ে আইনজীবী, শ্রমিকনেতা, ভুক্তভোগী ও আদালত-সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে তিনটি বড় কারণ জানা যায়। প্রথমত, মামলার তুলনায় আদালতের সংখ্যা কম। দ্বিতীয়ত, মামলা নিষ্পত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি। তৃতীয়ত, বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আইনজীবীরা, বিশেষ করে মালিকপক্ষের আইনজীবীরা মামলা বিলম্বে নানা যুক্তি দাঁড় করান। শ্রম আদালতে কাজ করা আইনজীবীদের সংগঠন লেবার কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সেলিম আহসান খান প্রথম আলোকে বলেন, দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেক বাদী শেষ পর্যন্ত মামলার খোঁজই নেন না। ফলে এসব মামলার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। মালিকপক্ষ পার পেয়ে যায়, শ্রমিক আর প্রতিকার পান না।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) কর্মক্ষেত্রে আঘাত ও মৃত্যুর শিকার কর্মীদের পক্ষ থেকে শ্রম আদালতে দায়ের করা ৮০টি ক্ষতিপূরণ মামলা ‘টায়ার দেম আউট: চ্যালেঞ্জিং অব লিটিগেটিং কমপেনসেশন ক্রেইমস আন্ডার বাংলাদেশ লেবার অ্যাক্ট ২০০৬’ শীর্ষক একটি গবেষণা বিশ্লেষণ করে ২০২১ সালে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে দেখা যায়, এসব মামলায় রায় দেওয়ার জন্য গড়ে ৬০১ দিন সময় লেগেছে। গবেষণাটিতে শ্রম আদালতে ক্ষতিপূরণ মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা ও মামলার রায়ে পরও ক্ষতিপূরণ দিতে মালিকপক্ষের অস্বীকৃতি জানানোর বিষয়টিও গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

শ্রম পরিবেশ দ্রুত উন্নতির তাগিদ উন্নয়ন সহযোগীদের

উন্নয়ন সহযোগীরা বাংলাদেশে শ্রম পরিবেশের উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন চায়। ১৯ নভেম্বর ২০২৪ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘৩+৫+১’ সংলাপে পাঁচ দেশ ও সংস্থার পক্ষ থেকে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলকে (ইপিজেড) অন্তর্ভুক্ত করে অভিনব শ্রম আইন প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগী পাঁচ দেশ ও সংস্থার প্রতিনিধিরা বর্তমান আইন সংশোধনে আর কালক্ষেপণ না করার পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রক্রিয়া আরও সহজ করার তাগিদ দিয়েছেন তারা। এসব উন্নয়ন লক্ষ্যসহ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এ-সংক্রান্ত পথনকশার অগ্রগতি সম্পর্কে তারা জানতে চেয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আইএলওর পথনকশা অনুযায়ী শ্রম খাতের বিভিন্ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। বাকি কাজ শেষ করতে না পারার কারণ হিসেবে করোনা অতিমারি, করোনার পরে জাতীয় নির্বাচন ও সব শেষ ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থান ও সরকার পরিবর্তনের বিষয়গুলো বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ২০২৩ সালে সর্বনিম্ন মজুরির দাবিতে আন্দোলনে যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তার একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রক্রিয়া সহজ করা, শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্ত না করা সহ ন্যাশনাল ট্রাইপাট্রাইট কনসালটেশন কাউন্সিলকে (এনটিসিসি) আরও কার্যকর ভূমিকায় রাখার আহবান জানান রাষ্ট্রদূতরা।

তারা বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশকে শ্রম খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো করতে হবে। আগামী ৬ মাস থেকে এক বছরের মধ্যে আবশ্যকীয় সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং বাংলাদেশের এ সংস্কারে কার্যক্রমসহ শ্রম খাতের যে

কোনো উন্নয়নে তারা পাশে থাকবেন। এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বাজারে প্রবেশ নিয়ে কোনো সংকটে পড়বে না বাংলাদেশ।

শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন

শ্রম অধিকার ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করার লক্ষ্যে সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, বিলসকে প্রধান করে ১০ সদস্যবিশিষ্ট শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে।

কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন- বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের (শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং পরিবেশ) সাবেক সচিব ড. মাহফুজুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ) অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির সভাপতি তপন দত্ত, বাংলাদেশ লেবার কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট এ কে এম নাসিম, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি ম. কামরান টি রহমান, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সভাপতি চৌধুরী আশিকুল আলম, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সাকিল আখতার চৌধুরী, আলোকচিত্রী ও শ্রমিক আন্দোলন সংগঠক তাসলিমা আখতার এবং একজন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি।

কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলপক্ষের মতামত বিবেচনা করে কমিশন গঠন পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করবেন।

চাতালের নারী শ্রমিকরা মজুরী বৈষম্যের শিকার

ধান ঝাড়াই-মাড়াই শেষে ধান সিদ্ধ, শুকানোসহ চাল প্রক্রিয়ার কাজে চাতালে পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে নারী শ্রমিকদের উপস্থিতি অনেক বেশি। ঘরের কাজ সেরে একটু ভালোভাবে জীবন যাপনের জন্য নারীরা পুরুষের পাশাপাশি চাতাল

কলগুলোতে কাজ করেন। কিন্তু মজুরির বেলায় তাঁরা প্রায় সময় বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। আবহাওয়া ভালো থাকলে ধান শুকানো থেকে শুরু করে তা মাথায় করে মিলে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত একজন শ্রমিক পান ৩৫০ টাকা। এ প্রক্রিয়া করতে সময় লাগে দুই দিন। অন্যদিকে যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে তাহলে একজন শ্রমিকের এ প্রক্রিয়া করতে পাঁচ থেকে ১০ দিন লেগে যায়। কিন্তু বেতন ৩৫০ টাকায় পান তাঁরা। যেখানে একজন পুরুষের দৈনিক বেতন ৫০০ টাকা, সেখানে এমন বেতন বৈষম্যের শিকার নারীরা।

অটোমেটিক রাইস মিলের দাপটে বেশিরভাগ হাসকিং মিল বন্ধ, বেকার হাজার হাজার শ্রমিক

দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা নওগাঁয় ৮২ শতাংশ চালকল একের পর এক বন্ধ হচ্ছে। অটোরাইস মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ব্যবসা গোটাচ্ছেন এ খাতের বিনিয়োগকারীরা। এর ফলে কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন প্রায় ৩৫ হাজার শ্রমিক। বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলায় ২৩০টি বয়লার হাসকিং মিল (চাতাল) মূলধন হারিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। চাতাল মিলের জায়গায় গড়া হচ্ছে অন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এতে ০৭ (সাত) হাজারের বেশি নারী-পুরুষ শ্রমিক বেকার হয়ে গেছেন। কোথাও কাজ না পেয়ে তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন।

হাসকিং চালকল মালিকদের অভিযোগ বেশিরভাগ অটোমেটিক রাইস মিলের মালিকরা মজুদ নীতিমালার তোয়াক্কা করেন না। সরকার কখনো তাদের লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করেনি। যার প্রভাবে নওগাঁয় ৮২শতাংশ হাসকিং চালকল মালিক ব্যবসা ছেড়েছেন। এ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় চালকল মালিকরা স্বল্প সুদে ব্যাংক থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ পান। ধান কাটার পরপরই বেশি পরিমাণ ধান কিনে রাখতে পারেন। যা সাধারণ চালকল-মালিকরা পারেন না। এসব কারণে চাতালগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

জাহাজ ভাঙা শিল্প শ্রমিকদের নিরাপত্তা আর কতদিন লাগবে?

বাংলাদেশে তালিকাভুক্ত শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড আছে ১৭৯টি। তবে বর্তমানে চালু আছে ৩০-৩৫টি। যার মধ্যে আন্তর্জাতিক মানের গ্রিনশিপ ইয়ার্ডের সংখ্যা ০৪(চার)টি। কিন্তু জাহাজভাঙা শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। জাহাজভাঙা কারখানার বিরুদ্ধে পরিবেশ ধ্বংস এবং শ্রম নিরাপত্তার অভাব শুরু থেকেই ছিল। দশকের পর দশক সংঘটিত এই শিল্পে দুর্ঘটনায় কত শ্রমিক নিহত ও আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, তাহার কোনো ইয়ত্তা নাই। বিশেষজ্ঞ ও অধিকারকর্মীদের মতে, শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রতি মালিকদের ‘নিছক গাফিলতি’র কারণে শিপ ইয়ার্ডে দুর্ঘটনা চলমান রয়েছে। আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট জাহাজটি ভাঙার নিমিত্তে তীরবর্তী স্থানে সন্নিবেশের পূর্বে বিষাক্ত উপাদানমুক্তকরণ বাধ্যতামূলক হইলেও কদাচিৎ তাহা মান্য করা হয়। উপরন্তু শ্রমিকদের জাহাজ ভাঙায় নিয়োজিতকরণের পূর্বে প্রশিক্ষণদানের বাধ্যতামূলক নিয়ম উপেক্ষিত থেকে যায়। খুব কম ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের পর্যাণ্ড নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৫ সাল থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ইয়ার্ডে দুর্ঘটনায় ২৫৮ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশন এর প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কাজ করার সময় ১১জন শ্রমিক নিহত ও আহত হয়েছেন ৬জন। ইয়ার্ডে কাজ করার সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইয়ার্ড মালিকরা ৭ লাখ টাকা ও যারা পঙ্গুত্ববরণ করেন, তাদের আড়াই লাখ টাকা প্রদান করে থাকেন। এতেই তাদের কাজ শেষ হয়। এরপর আর শ্রমিক পরিবারের কোনো খোঁজখবর নেয় না।

শ্রম আইন অনুযায়ী, প্রত্যেক শ্রমিককে ২ ঘণ্টা অন্তর আধঘণ্টা বিশ্রাম দিতে হয়। বাস্তবে শিপব্রেকিং ইয়ার্ডে শ্রমিকরা একাধিক্রমে ৮-১০ ঘণ্টা ডিউটি করতে বাধ্য হন। রাত ৮টার পর জাহাজ না কাটার জন্য বলা হলেও সেই নির্দেশনাও অনেক ইয়ার্ড মানছেন না। জাহাজ ভাঙা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরাম আয়োজিত এক মানব-বন্ধনে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বলেন, জাহাজ ভাঙা শ্রমিকরা যে মজুরি পান তা দিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। জাহাজ ভাঙা শিল্পে ২০১৮ সালে ঘোষিত মজুরি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। মজুরি ঘোষণার পাঁচ বছর পার হয়ে গেলেও শ্রম আইন অনুসারে নতুন মজুরি বোর্ড ঘোষণার সময় হয়ে গেছে। তাই অবিলম্বে নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করে জাহাজ ভাঙা শ্রমিকদের নিম্নতম মাসিক মজুরি ২০ হাজার টাকা ঘোষণা করা, হতদরিদ্র শ্রমিকদের ন্যূনতম জীবন-মান বজায় রাখার স্বার্থে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করা, পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য রোধে স্থায়ী এবং দীর্ঘ মেয়াদে সমাধানকল্পে দেশের সব দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও জাহাজ ভাঙা শ্রমিকসহ সব খাতের শ্রমিকদের জন্য ন্যায্যমূল্যে রেশনিং ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং সারা দেশে শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় টিসিবির অধীনে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করার জন্য আসন্ন বাজেটে পর্যাণ্ড বরাদ্দের দাবি জানানো হয়।

চামড়া শিল্প শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম ২২ হাজার ৭৭৬ টাকা মজুরি প্রস্তাব

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত ‘ট্যানারি শিল্পে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ’ বিষয়ে আয়োজিত মিডিয়া ব্রিফিং ও আলোচনা অনুষ্ঠানে এ মজুরি প্রস্তাব করা হয়। ট্যানারি শ্রমিকদের জন্য মোট পাঁচটি গ্রেডে মজুরি প্রস্তাব করা হয়। এর মধ্যে পঞ্চম গ্রেডের জন্য ন্যূনতম ২২ হাজার ৭৭৬ টাকা এবং প্রথম গ্রেডের জন্য ন্যূনতম ৩৯ হাজার ২৭০ টাকা প্রস্তাব করা হয়।

সিপিডি জানায়, বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে ট্যানারি বা চামড়া শিল্প খাতের একটি শ্রমিক পরিবারের প্রয়োজনীয় খাবারের খরচ মাসে ২০ হাজার ৫৬৪ টাকা। আর খাদ্যবহির্ভূত খরচ ১২ হাজার ৯১৪ টাকা। একটি শ্রমিক পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৪ দশমিক ৬ জন। এর মধ্যে উপার্জনক্ষম সদস্য ১ দশমিক ৫ জন। সেই হিসাবে একজন শ্রমিকের মাসিক ন্যূনতম মজুরি হওয়া দরকার ২২ হাজার ৭৭৬ টাকা।

সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ‘শ্রমিকদের দাবি ২৫ হাজার টাকা আর মালিকদের প্রস্তাব ১৫-১৬ হাজার টাকা। আশা করছি, মজুরি বোর্ড সব পক্ষের প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে।’

ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুল মালেক জানান, সিপিডির প্রস্তাবটি আমাদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মেলেনি। আমরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২৫ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি বিষয়ে একটি প্রস্তাব তৈরি করেছি। প্রস্তাবটি এরই মধ্যে মালিকপক্ষ ও মজুরি বোর্ডের কাছে দেয়া হয়েছে।

চামড়া শিল্পকে সাভারে স্থানান্তরিত হলেও বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি: ৮ হাজার শ্রমিকের মানবেতর জীবন

২০১৭ সালে বিসিকের নেতৃত্বে রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি শিল্পকে সাভারের হেমায়েতপুরে সরিয়ে নিয়েও চামড়া শিল্পনগরের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। কমপ্লায়েন্সের অভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় চামড়ার মূল্য কমেছে। আবার ট্যানারির শ্রমিকরাও ন্যূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আবাসন, চিকিৎসাসহ শ্রমিকদের জীবন-যাপনের মৌলিক চাহিদা পূরণের নেই যথাযথ ব্যবস্থা। অসুখ-বিসুখ ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে নাজেহাল তারা। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে কেউ পরিবারকে গ্রামে পাঠিয়েছেন, কেউ সন্তানকে স্কুলছাড়া করেছেন। শ্রমঘন ও ঝুঁকিপূর্ণ

শিল্প এলাকাটির ১৫৫টি প্লটে প্রায় ২০০ ট্যানারিতে কর্মরত ৮হাজার শ্রমিকের জীবন এভাবেই যাচ্ছে। তবে এই শিল্পনগরে কর্মরত বেশিরভাগ শ্রমিক জানিয়েছেন, মজুরি বোর্ডের নির্ধারিত গ্রেড নয়, অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের বেতন নির্ধারিত হয়। এছাড়া ওভারটাইম ও ছুটির সুবিধা তারা পান না। তাদের নেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা। সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থাও ঠিকমতো করতে পারেন না তারা।

ট্যানারিগুলোতে স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই ধরনের শ্রমিক কাজ করেন। ফড়িয়া বা দালালরা বাইরে থেকে চামড়া এনে বিভিন্ন ট্যানারিতে প্রক্রিয়াজাত করেন। তারা বেশিরভাগই অস্থায়ী শ্রমিকদের কাজে লাগান। অন্যদিকে অনেক কারখানাও অস্থায়ী শ্রমিকদের ব্যবহার করেন। শিক্ষানবিশ শ্রমিকদের এখানে কোনো বেতন দেওয়া হয় না। তাদের দেওয়া হয় ‘হাত খরচ’। ট্যানারিভেদে স্বল্প অভিজ্ঞ শ্রমিকদের ৭ হাজার থেকে ৯ হাজার ও অভিজ্ঞ শ্রমিকদের ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয়। ট্যানারিগুলোতে নারী শ্রমিকের সংখ্যাও নগণ্য।

বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে প্রতি দুই বছর পর পরই দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করে আসছে। তবে মালিকরা সব সময়ই পুরো চুক্তি বাস্তবায়নে অনীহা দেখান। যার ফলে শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকছেন।

ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক বলেন, মালিকদের দুটি সংগঠনের সঙ্গে আমরা প্রায় ২২টি সিবিএ চুক্তি করেছি। প্রতি ২ বছর পর এসব চুক্তি হয়েছে। ন্যূনতম মজুরি ও সিবিএ চুক্তির যদি বাস্তবায়ন হতো তাহলে শ্রমিকদের সমস্যা দূর হতো। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দাবি আদায়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

তবে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির সাম্প্রতিক জরিপ বলছে, ৬৯ শতাংশ ট্যানারি কোনো গ্রেডিংয়ের ধার ধারে না। ট্যানারি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ শীর্ষক ওই জরিপে বলা হয়, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের ট্যানারি শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি অনেক কম। সাভারে ৩৫টি ট্যানারি শ্রমিকদের মধ্যে জরিপটি করা হয়।

চুক্তির শর্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হলে কোনো শ্রমিকেরই অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে থাকার কথা নয়। তবে স্থায়ী কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা ১০ থেকে ১৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে কাজ করেও ‘স্থায়ী’ হতে পারেননি। দীর্ঘ সময় পরও তাদের অস্থায়ী হিসেবে আখ্যায়িত করে স্থায়ী শ্রমিকের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য আবাসন ও চিকিৎসা সুবিধা দিতে চাইছেন না মালিকরা।

পরিবারের খরচ চালাতে ঋণ গ্রহণ: শ্রমিকরা বলেন, সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে চলে অনেক পরিবার। পরে মাসিক কিস্তিতে সেই ঋণ পরিশোধ করেন। বাসা ভাড়া ও থাকা খাওয়ার খরচ তারা বলেন, এখানে আড়াইহাজার টাকার নিচে কোনো রুম নেই। কোনো রুমে দু’জনও থাকে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল মিলিয়ে শুধু থাকাতেই ৪ হাজার টাকা খরচ হয়। খাওয়া ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে একজন শ্রমিকের ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা খরচ হয়।

নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা: হরিণধরা ও ঝাউচর এলাকায় বেশ কয়েকটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার থাকলেও নেই কোনো বিশেষায়িত হাসপাতাল বা কোনো সরকারি হাসপাতাল। এ কারণে বড় কোনো দুর্ঘটনা ও রোগে শ্রমিকদের ঢাকায় ছুটতে হয়। ট্যানারি এলাকায় ৫থেকে ৬টি হাসপাতাল রয়েছে। ট্যানারির ভেতরে শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসে মাঝে মধ্যে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে কয়েকটি এনজিও। শ্রমিকদের জ্বর-ঠান্ডা-চর্মরোগ লেগেই

থাকে। এ ছাড়া কেমিক্যালের দুর্ঘটনার শিকার হন শ্রমিকরা। বেশিরভাগ শ্রমিক রোগ পুষে রাখেন, ঢাকায় গিয়ে চিকিৎসা নিতে চান।

অন্যান্য অসুখে মেডিক্যাল ক্যাম্পের বিনামূল্যে দেওয়া ওষুধের ওপর নির্ভরশীল থাকেন তারা। সিপিডির এক জরিপে জানা যায়, শ্রমিকদের ৪১ দশমিক ৯ শতাংশ শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ, ৬৪ দশমিক ৮ শতাংশ অ্যালার্জি, ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ চর্মরোগ ও ৩২ দশমিক ৪ শতাংশ চোখের সমস্যায় ভোগেন। ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক বলেন, মালিকদের কাছে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল হাসপাতাল নির্মাণের। মালিকরা আমাদের সাভারে হাসপাতাল করে দেওয়ার কথা দিয়েছিলেন। বাসস্থানের দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনোটিই বাস্তবায়ন হয়নি।

শিক্ষার বেহাল অবস্থা: একই অবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থার। ট্যানারি এলাকায় দুটি বেসরকারি স্কুল ও তিনটি সরকারি স্কুল রয়েছে। আরও রয়েছে বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা। তবে স্কুলের চেয়ে মাদ্রাসায় শ্রমিকদের সন্তানরা বেশি পড়াশোনা করে। ঝাউচর আল নূর মডেল একাডেমি স্কুলের শিক্ষকরা জানান, তার স্কুলে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। যার মধ্যে ৫০ থেকে ৬০ জন ট্যানারি শ্রমিকের সন্তান।

ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বলেন, ট্যানারি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা মানসম্মত শিক্ষা ও চিকিৎসা পান না। অধিকাংশ শ্রমিক তাদের সন্তানদের লেখাপড়া করানোর সুযোগ দিতে পারে না। এখন কেউ কেউ যুগের চাহিদানুযায়ী খেয়ে না খেয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাচ্ছে। অভাবের তাড়নায় অনেকে ছেলেমেয়েদের কাজে লাগিয়ে দেয়।

মূল্যস্ফীতির যাতাকলে চা শ্রমিকদের মানবেতর জীবন

১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনীছড়া চা বাগানে ব্রিটিশ ভারতের বাংলাদেশ অংশে প্রথম বাণিজ্যিক-ভিত্তিতে চা চাষ শুরু হয়। স্ট্যাটিস্টিক্যাল হ্যান্ডবুক অন বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রি বুক ২০১৯-এর তথ্য মতে, দেশের ১৬৬টি (বর্তমানে ১৬৮টি) চা বাগানে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ১ লাখ ৩ হাজার ৭৪৭। অস্থায়ী চা শ্রমিকের সংখ্যা ৩৬ হাজার ৪৩৭ এবং চা জনগোষ্ঠীর মানুষ ৪ লাখ ৭২ হাজার ১২৫ জন। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্যানুযায়ী, এ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। এর মধ্যে অনিয়মিত ও বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। আর চা জনগোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা প্রায় আট লাখ। এদের দুই-তৃতীয়াংশ মৌলভীবাজারের ৯০টি চা বাগানে বসবাস করেন।

চা শ্রমিকরা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে একমুঠ মুড়ি আর এক কাপ চা খেয়ে কাজে নেমে পড়েন শ্রমিকরা। কাঠফাটা রোদে দিনভর সংগ্রহ করেন চা পাতা। দুপুরে চা পাতার চাটনি মেখে খান ভাত, কখনো সঙ্গে থাকে মুড়ি কিংবা চানাচুর। রুটিতে ভিজে, খালি পায়ে, জোঁক আর বিষাক্ত সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে চা বাগানকে আঁকড়ে জীবন পার করছেন তারা। সবুজ কুঁড়িবেষ্টিত চা বাগানের সীমানাতেই আটকে আছে তাদের জীবন। বংশ পরম্পরায় যে জমিতে চা শ্রমিকরা বসবাস করেন, সেই জমির ওপর কখনোই মেলে না অধিকার। তাই মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু ধরে রাখতে হলে পরিবারের কাউকে নাকাকড়ে বাগানে কাজ করতেই হয়। দিনশেষে ২৩ কেজি পাতা তুললেই তবে পূরণ হয় মাথাপিছু লক্ষ্যমাত্রা। মূল্যস্ফীতির এই সময়ে দৈনিক ১৭০ টাকা মজুরিতে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন চা শ্রমিকরা। তাদের অভিযোগ, অধিকাংশ চা বাগান শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকার যথাযথ পূরণ করে না। এছাড়া শ্রম আইন ও দ্বিপক্ষীয় চুক্তির শর্তগুলো সঠিকভাবে মানা হয় না। চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের মতে, "শ্রমিকদের যে সুবিধা দেওয়ার

কথা, তার যদি ৮০ ভাগও শ্রমিকরা পেতেন, তাহলে শ্রমিকদের জীবন বদলে যেতো। এখন ৫০ ভাগ সুবিধাও পান না শ্রমিকরা। শ্রমিকদের জীবন বদলে দেওয়ার জন্য আমরা সংগ্রাম করে যাচ্ছি।"

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ অকুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশন এর প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে চা খাতে ৩ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

কাজে ফিরেছেন ন্যাশনাল চা বাগানের শ্রমিকরা

ন্যাশনাল চা কোম্পানির ১৮টি বাগানে চা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি প্রদান ও বিভিন্ন দাবি দাওয়া বাস্তবায়নের দাবিতে টানা ৩৭ দিন আন্দোলন করেছেন। মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল শ্রম অধিদফতর কার্যালয়ে চা শ্রমিকদের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও ন্যাশনাল চা কোম্পানির কর্তৃপক্ষের যৌথ বৈঠকে দাবি পূরণের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে সবকটি বাগানের চা শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) থেকে কাজে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী-

১. ৫ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) কাজে যোগ দেয়ার প্রথম দিন শ্রমিকদের ২সপ্তাহের বকেয়া মজুরি দেয়া হবে।
২. মাসিক বেতনধারী শ্রমিকদের ১মাসের বেতন দেয়া হবে।
৩. শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন নিয়মিত পরিশোধ করা হবে।
৪. বাগানের কর্মচারীদের ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে ১ মাসের বেতন দেয়া হবে।
৫. এছাড়া বাগান বন্ধের দিনগুলোতে চা শ্রমিকদের রেশন কাটা হবে না।
৬. বোনাস ও বার্ষিক ছুটির দিন গণনার ক্ষেত্রে বাগান বন্ধের দিনগুলো অনুপস্থিত দেখানো হবে না।
৭. অবশিষ্ট বকেয়া মজুরি আগামী ২০২৫ সালের মার্চ এর মধ্যে পরিশোধ করা হবে। একই সঙ্গে ২০২৫ সালের ৭ এপ্রিলের মধ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করা হবে।

জাতীয় শ্রেষ্ঠ জয়িতার সম্মাননা পেয়েছেন চা-শ্রমিক কমলি রবিদাস

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নানা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ পাঁচজন জয়িতাকে সম্মাননা দেওয়া হয়। এবার সেই জাতীয় শ্রেষ্ঠ জয়িতার সম্মাননা পেয়েছেন মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের কানিহাটি চা বাগানের চা-শ্রমিক মা কমলি রবিদাস।

কমলি রবিদাসের এমন অর্জনের খবরে আনন্দিত ছেলে সন্তোষ রবিদাসও। তিনি বলেন, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের কানিহাটি চা-বাগানের এক শ্রমিক পরিবারে তার জন্ম। জন্মের পরপরই তিনি বাবাকে হারিয়েছিলেন। তার মা কমলি রবিদাস তখন চা বাগানে কাজ করে মজুরি পেতেন দৈনিক ১৮ টাকা।

চরম অভাবের মধ্যে খুব কষ্ট করে লেখা-পড়া করেছেন সন্তোষ। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ছেলের ভর্তির টাকা, ইউনিফর্ম আর বই-খাতা কিনে দিয়েছিলেন মা। ঋণের কিস্তি শোধের জন্য চা-বাগানের কাজ ছাড়াও অনেক দূরে গিয়ে বালু শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন তিনি। অভাবের সংসারে নিজে খেয়ে না খেয়ে ছেলেকে পড়ালেখা করিয়েছেন। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে পড়ার সুযোগ পান সন্তোষ।

মা-ছেলের এই সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে ২০২২ সালে 'মায়ের নামটা কেটে দিল' এমন শিরোনামে একটি ঘটনার বিস্তারিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের ফেসবুক আইডিতে লিখেন সন্তোষ। সেই সূত্র ধরে অন্তত ১০টি প্রতিষ্ঠান সন্তোষকে চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিল। পরে তিনি যোগ নে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে জুনিয়র অফিসার পদে। এখন তিনি ব্যাংকটির সিলেট লালদীঘির পাড় শাখায় রিলেশনশিপ অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। উল্লেখ্য যে, 'এর আগে কমলি রবিদাস উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সম্মাননা পেয়েছেন।

গণ-পরিবহনে নিয়োজিত শ্রমিকদের দিনকাল

‘পরিবহন শ্রমিকরা অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় অবদান রাখছেন। কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধের পর থেকে এখনো তারা বৈষম্যের শিকার। তাদের সঙ্গে বাস মালিকরা বিভিন্ন ছলচাতুরী করে থাকেন। ফলে শ্রমিকদের ভাগ্যের ঢাকা আর ঘুরে না। সেই সঙ্গে শ্রমিকরা অর্থাভাবে নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন। শ্রম আছে কিন্তু পরিচয় নেই। মুখে ডাইভার-হেলপার বলে ডাকা হলেও নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র নেই। অথচ সারা দেশে পরিবহন খাতে কাজ করছেন প্রায় ০১(এক) কোটি শ্রমিক। ২০১৮ সালের সড়ক পরিবহন আইনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সালের ৪২ নম্বর আইন অনুযায়ী লিখিতভাবে চুক্তি সম্পাদন ও নিয়োগপত্র দেওয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যক্তিকে গণপরিবহনের চালক হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন না। কোনো ব্যক্তিও গণপরিবহনের চালক হতে পারবেন না। এরপরও বাস কোম্পানিগুলো আইনকে দেখিয়ে আসছে বৃদ্ধাঙ্গুলি। তাদের কাছে জিম্মি পরিবহন শ্রমিকের ন্যূনতম অধিকারটুকুও।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের হিসাব অনুযায়ী, তাদের সংগঠনে নিবন্ধিত ছিল ৫০ লাখ শ্রমিক। এর বাইরে আরও ২০ লাখ শ্রমিক রয়েছেন। বিআরটিএর নিবন্ধিত গাড়ির সংখ্যা ২০২৪ এর জুন পর্যন্ত ৬১ লাখ ১৩ হাজার ৪৫৩টি। এর মধ্যে বাস ৫৫ হাজার ২৮৩টি। আর মিনিবাস রয়েছে ২৮ হাজার ৩৬৩টি। এর বাইরেও অনেক পরিবহন আছে যেগুলোর হিসাব বিআরটিএর তালিকায় নেই।

যেকোনো উৎসবে শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হয় না। বেশিরভাগ মালিক বেতনে নয় চুক্তিতে গাড়ি চালাতে দেন। পরিবহন শ্রমিকরা সরকারিভাবে কোনো সুযোগ-সুবিধা পান না। তা ছাড়া পরিবহন শ্রমিকদের শীর্ষ নেতারা বেশিরভাগই বাস মালিক। ফলে শ্রমিকদের কল্যাণে বা পক্ষে তারা কথা বলেন না। শ্রমিকদের ওপর

ভর করে সবাই লাভবান হলেও তাদের কল্যাণে কোনো ভূমিকা কেউ রাখেনি।

গণপরিবহণ ও ব্যক্তিগত গাড়ির চালকদের বেশির ভাগই নানা রোগে আক্রান্ত

ঢাকা আহুনিয়া মিশন এর এক প্রতিবেদনে জানা যায়, দেশের বিভিন্ন গণপরিবহণ ও ব্যক্তিগত গাড়ির চালকদের বেশির ভাগই নানা রোগে আক্রান্ত। এদের মধ্যে ৭৩ ভাগই চোখে দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যায় ভুগছেন। অন্যদিকে ৬০ ভাগেরও বেশি চালক গাড়ি চালানোর জন্য শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ নন। তাদের কেউ উচ্চ রক্তচাপ, কেউ উচ্চ ব্লাড সুগারে ভুগছেন। চোখের সমস্যাসহ নানা ধরনের অসুস্থতা নিয়েই চালকদের এই অংশটি গাড়ি চালায়। এতে করে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা।

সংস্থাটি রাজধানী ঢাকাসহ জেলা পর্যায়ে ৮২৪ জন চালকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে। তাদের মধ্যে ৫৪১ জন চালক চক্ষু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এতে দেখা যায়, ৫৪১ জন চালকের প্রায় ৭৩ ভাগেরই দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যা পাওয়া গেছে। তাদের চশমা ব্যবহার করা প্রয়োজন। এছাড়া ৪ ভাগ চালকের চোখে ছানি সমস্যা এবং ২৩ ভাগ অন্যান্য চোখের সমস্যা যেমন-শুষ্ক চোখ, অ্যালার্জির সমস্যা ইত্যাদি পাওয়া যায়। ৩১ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত ২৬ ভাগ এবং ৪১ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত ২৩ ভাগ চালকের চোখের সমস্যা পাওয়া গেছে। এছাড়া ৪০০ জন চালকের ব্লাড সুগার হাই যা শতকরা হিসাবে ৪৯ ভাগ। উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন ৩১ ভাগ চালক। এছাড়া উচ্চ ব্লাড সুগার এবং উচ্চ রক্তচাপ উভয় সমস্যায়ই ভুগছেন ১৭ ভাগ চালক। ৬০ ভাগের বেশি চালক গাড়ি চালানোর জন্য শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ নন।

আইনে চালকদের এমন স্বাস্থ্যগত সমস্যা নিয়ে গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পাওয়া ও নবায়নের সুযোগ না থাকলেও দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)- এর কিছু

অসাধু কর্মীর যোগসাজশে কোনো ধরনের শারীরিক পরীক্ষা ছাড়াই দালালের মাধ্যমে লাইসেন্স নবায়ন করে নিচ্ছেন।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশন এর প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে পরিবহন খাতে ৫২২জন শ্রমিক নিহত ও আহত হয়েছেন ৫২জন শ্রমিক।

প্রবাসে কর্মরত শ্রমিকদের দিনকাল

যেখানে টাকা সেখানেই দালাল, প্রতারক। দেশের এমন কোনো সেক্টর নেই, যেখানে দালালদের দৌরাত্ম্য নেই। যে কারণে দেখা যায়, দেশের সহজ-সাধারণ মানুষ, যারা একটু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন তারাও এক-সময় নিজেকে প্রতারিত হিসেবে আবিষ্কার করছেন। একই সঙ্গে বিদেশের মাটিতে কী যে দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হচ্ছে তাদের, কেবল ভুক্তভোগীই জানেন। প্রবাসীদের কষ্ট, হয়রানি আর বিড়ম্বনার শেষ নেই। তাদের বলা হয় ‘রেমিট্যান্স যোদ্ধা’। কিন্তু এই যোদ্ধাদের সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি সৌদি আরব ও মালয়েশিয়ায় প্রবাসী শ্রমিকরা অনেক বেশি প্রতারিত হচ্ছেন। দুই দেশের কর্তৃপক্ষ অবৈধ প্রবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছে। অনেক অবৈধ প্রবাসী বাংলাদেশিও আটক হয়েছে। অনেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। শ্রমবাজার সংশ্লিষ্টদের দায়সারা কর্মকান্ডের কারণে কিছু এজেন্সি ও দালাল অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে প্রতারণা করছে। বিশ্বের ১৭৬টি দেশে কর্মরত রয়েছেন ১ কোটি ৪৯ লাখের বেশি কর্মী।

শ্রমিকদের কাজ-বেতন না দিলে

৩০ বছর কারাদন্ড

মালয়েশিয়ায় কলিংভিসায় গিয়ে কাজ ও খাওয়ার না পাওয়া ২১ বাংলাদেশির কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিচ্ছে দেশটির অভিভাসন বিভাগ। ২১ বাংলাদেশি নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে



মানবপাচার বিরোধী এবং অভিবাসী আইন (এটিআইপিএসওএম) ২০০৭ (অ্যাক্ট ৬৭০) অনুযায়ী তদন্ত চলছে। এছাড়া এরই মধ্যে যেসব নিয়োগকর্তা শ্রমিকদের এনে কাজ দিতে পারছে না, তদন্তে অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের লাইসেন্স বাতিলসহ দেশটির প্রচলিত আইনে সর্বোচ্চ ৩০ বছর অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বুধবার (১০ জানুয়ারি ২০২৪) মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের (জেআই-এম) মহাপরিচালক রুসলিন জুসোহ এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

মালয়েশিয়ায় শোষণের শিকার ৯৬ শতাংশ বাংলাদেশি শ্রমিক

মালয়েশিয়াভিত্তিক ডেরিটে, শোভা কনসালট্যান্টস, বোমসা এবং ওয়ারবি-ডিএফ নামে চারটি সংস্থা শ্রমিকদের ওপর অর্পিত আর্থিক বোঝা এবং কর্মস্থলে শোষণের বিষয় নিয়ে ২০১৮-২৩ সালে 'ফস্টারিং ফি অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড কস্ট ট্র্যাকিং' শিরোনামে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই সমীক্ষায় ৩৫৭টি সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং মালয়েশিয়ায় ২৪০ অভিবাসী শ্রমিকের

কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনে জানা যায়, মালয়েশিয়াগামী অভিবাসী শ্রমিকদের ৯৬ শতাংশ নিয়োগের ফি পরিশোধ করার জন্য কমপক্ষে একটি ঋণ নিয়েছে, যা পাসপোর্ট, ভিসা, মেডিকেল চেকআপ এবং মালয়েশিয়ায় গমনের খরচের অন্তর্ভুক্ত। অধিকন্তু, ৮২ শতাংশ কর্মীকে দুই বা ততধিক ঋণ করতে হয়েছে, ৭৩ শতাংশ কর্মী মাসিক বেতনের ৫০-১০০ শতাংশ সেই ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় করেন। মজুরি প্রতারণা বিষয়ে ৪৩ শতাংশ উত্তরদাতা প্রতিশ্রুত বেতনের চেয়ে কম টাকা পান বলে জানান। জরিপভুক্তদের মধ্যে ৬৩ শতাংশ কর্মী ঋণ পরিশোধের জন্য বেশ উদ্বেগজনক অবস্থায় থাকেন। গবেষণায় আরও বলা হয়, বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের গড়ে প্রায় ৫ লাখ ৪৪ হাজার টাকা দিতে হয়েছে, যা একজন কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানে এক বছরের মজুরির সমান।

মালয়েশিয়ায় শোষণের শিকার বাংলাদেশি শ্রমিকরা: জাতিসংঘ

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশি অভিবাসীরা মালয়েশিয়ায় শোষণের শিকার হচ্ছেন বলে জেনেভা কে একটি

বিবৃতি প্রদান করেছেন। তাঁরা বলেন, কয়েকমাস ধরে মালয়েশিয়ায় বসবাসকারী বাংলাদেশি শ্রমিকরা খুব খারাপ অবস্থায় আছেন। তাদের শোষণ, অবিচার ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ নিতে হবে। বেশিরভাগ অভিবাসী মালয়েশিয়ায় পৌঁছে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ পান না। এমন অবস্থায় ভিসা শেষ করতে বাধ্য হন তারা। ফলে গ্রেপ্তার, আটক, দুর্ব্যবহার ও নির্বাসনের ঝুঁকিতে পড়েন অভিবাসীরা। এই পরিস্থিতি কে উত্তরণে তাঁরা মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের অপরাধ নেটওয়ার্কগুলো তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ এই চক্রের বিরুদ্ধে অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতারণামূলক নিয়োগের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন অভিযোগ রয়েছে। তাদের সঙ্গে দুই দেশের সরকারের কিছু উচ্চ-পর্যায়ের কর্মকর্তারা জড়িত আছেন। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এটি বন্ধ হওয়া দরকার। এই অপরাধীদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

মালয়েশিয়াকে অবশ্যই পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রম অভিবাসনকে পরিচালনা করতে হবে। এছাড়া অভিবাসী কর্মীদের রক্ষা করার জন্য

জাতিসংঘের নির্দেশিকা নীতির অধীনে চলতে হবে। মালয়েশিয়াকে শোষণের শিকার ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ, সুরক্ষা এবং সহায়তা করতে হবে। ব্যক্তি পাচারের বিরুদ্ধে আইন কার্যকর এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

মালয়েশিয়ায় যেতে পারেননি ৫৯৫৩ কর্মী

জনশক্তি কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) মালয়েশিয়ায় ৫ লাখ ২৪ হাজার ৯৮৪ নিয়োগ অনুমতির বিপরীতে ৪ লাখ ৯৪ হাজার ১০২ জনকে ছাড়পত্র প্রদান করে। জনশক্তি ব্যবসায়ীদের সূত্র জানিয়েছে, ২০২২ সালের ৮ আগস্ট থেকে ০১ জুন পর্যন্ত প্রায় ৪ লাখ ৭৭ হাজার কর্মী মালয়েশিয়া পৌঁছেছেন। ছাড়পত্র পাওয়া বাকি ১৭ হাজার কর্মীর একটি অংশের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে মালয় সরকার কালো তালিকাভুক্ত করেছে। ফলে তাদের যাওয়ার সুযোগ ছিল না। ভিসা পাওয়াসহ সব প্রক্রিয়া শেষ করেও বিমানের টিকিট না পাওয়ায় ৫ হাজার ৯৫৩ জন বাংলাদেশি কর্মী মালয়েশিয়া যেতে পারেননি। টিকিটের জন্য এসকল কর্মীদের পাসপোর্ট রয়েছে রিট্রুটিং এজেন্সির কাছে। ২১ মার্চ মালয়েশিয় সরকার জানিয়েছেন যে, বিদেশি কর্মীদের জন্য তাদের শ্রমবাজার ৩১ মে বন্ধ হয়ে যাবে। ৭০ দিন আগে জেনেও ভিসা পাওয়া সব কর্মীকে নির্ধারিত সময়ে পাঠাতে পারেনি বাংলাদেশ। ফ্লাইট সংকটে শেষ দুই সপ্তাহে ঢাকা-কুয়ালালামপুরের বিমান ভাড়া ২৫ হাজার থেকে বেড়ে লাখ টাকার বেশি হয়। এরপরও টিকিটের জন্য বিমানবন্দরে হুমড়ি খেয়ে পড়েন ভিসা পাওয়া হাজারো কর্মী। সরকার মালয়েশিয়া যাওয়ার খরচ ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা নির্ধারণ করলেও এসকল কর্মীরা ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা করে দিয়েছেন রিট্রুটিং এজেন্সি এবং আদম ব্যাপারীদের। বায়রা মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী সমকালকে বলেছেন, যেতে না পারা কর্মীদের টাকা ফেরত দেবে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি। সরকার নির্ধারিত ৭৯

হাজার টাকা, নাকি কর্মী যত টাকা দিয়েছেন তার পুরোটাই ফেরত দেবে প্রশ্নে তিনি বলেন, কর্মীর কাছে যত টাকা পাওয়ার প্রমাণ রয়েছে, তত টাকাই ফেরত পাবেন।

তবে প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী জানিয়েছেন, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে না পারার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি হবে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কর্মীদের মালয়েশিয়া পাঠাতে ফ্লাইটের বিষয়ে বলেন, বিমানের সঙ্গে কথা বলে ২২টি বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা এবং সময় বৃদ্ধির জন্য মালয়েশিয়া সরকারকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন দেশের কারাগারে আটক ১১ হাজার বাংলাদেশি

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. আবদুল মোমেন বলেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১১ হাজার বাংলাদেশি প্রবাসী কারাবন্দি রয়েছেন। সবচেয়ে বেশি কারাবন্দি আছেন সৌদি আরবে। সেখানে প্রায় ৬ হাজারের মতো প্রবাসী কারাগারে রয়েছেন। সৌদির পরে সবচেয়ে বেশি বন্দি রয়েছেন কাতার ও কুয়ালালামপুরে। যেসব দেশে বাংলাদেশি কারাবন্দি রয়েছেন, সেসব দেশের দূতাবাসকে প্রতি মাসে একাধিকবার কারাগার পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তারা পরিদর্শন করে বন্দিদের তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং তাদের দেশে ছাড়িয়ে আনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

সৌদিতে প্রতিদিন চার বাংলাদেশির মৃত্যুর কারণ অজানা! দিনে ১২ প্রবাসীর লাশ আসে দেশে

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান সৌদি আরবের বাংলাদেশি কর্মীদের মৃত্যু নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, গত বছর বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে গিয়েছেন প্রায় ৫০ হাজার কর্মী। এই প্রবাসী কর্মীরা অনেকেই তরুণ

এবং বেশ সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী। বাংলাদেশ সরকার বলছে, ২০০৮-২২ সালে অর্থাৎ ১৪ বছরে সৌদি আরবে কমপক্ষে ১৩ হাজার ৬৮৫ বাংলাদেশি কর্মী মারা গেছেন। তাদের মধ্যে ২০২২ সালে মারা যান ১ হাজার ৫০২ জন। প্রতিদিন গড়ে চারজনের বেশি বাংলাদেশি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে পুরুষের গড় আয়ু ৭১ বছর। ২০২২ সালে সৌদি আরবে গিয়ে যেসব বাংলাদেশি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে, সেগুলো ‘স্বাভাবিক’ বলে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের গড় বয়স নির্ণয় করা হয় ৪৪ বছর। সৌদি প্রশাসনের নথিপত্রে ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া বাংলাদেশিদের ৭৬ শতাংশের মৃত্যুকে ‘স্বাভাবিক’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তবে সংবাদমাধ্যমটির অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। মৃত্যুসনদে কখনো ‘স্বাভাবিক কারণ’, ‘হৃদযন্ত্রের সমস্যা’ কিংবা ‘শ্বাসতন্ত্রজনিত সমস্যা’র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে ময়নাতদন্তের উদ্যোগও দেখা যায় না। যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ফেয়ার স্কার বলছে, উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে মারা যাওয়া প্রবাসী কর্মীদের ৫০ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করা হয় না। কঠোর পরিশ্রম, নিষ্পেষণ, শোষণ, কাজের চাপ ও হিটফোর্টাক মৃত্যুর হার বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য মতে, ১৯৯৩ সাল থেকে গত ৩১ বছরে ৫২ হাজার ৩৭১ প্রবাসীর লাশ দেশে এসেছে। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিবছরই লাশের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

২০২০ সালে বেসরকারি সংস্থা অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম (ওকাপ) একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এতে দেখা যায়, ৯৫ শতাংশ অভিবাসী কর্মীর মৃত্যুর পর আর্থিক সংকটে পড়ে যায় তার পুরো পরিবার। তার মধ্যে ৫১ শতাংশ পরিবারের ৮০ ভাগ আয় কমে যায়। পাশাপাশি ৮১ শতাংশ পরিবার স্বাস্থ্যসেবা পেতে

সংকটে পড়ে, ৬১ শতাংশ পরিবারের সন্তানেরা স্কুলে যাওয়ার সক্ষমতা হারায়, আর ৯০ শতাংশ পরিবারই দৈনিক খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

প্রবাসী কর্মীর মৃত্যুর পর ৪৮ শতাংশ পরিবারই বিষন্নতায় ভোগে, ৪০ শতাংশ পরিবারের ঘুমের জটিলতা তৈরি হয়। তাছাড়া কিছু কিছু পরিবারের এক ধরনের দায় চাপাচাপির মতো পরিবেশ তৈরি হয়।

বিদেশ থেকে শ্রমিক নেওয়ার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করেছে কুয়েত সরকার

শ্রমিক সংকট দূরীকরণ এবং শ্রমিক নিয়োগের খরচ কমাতে বিদেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছে কুয়েত সরকার। কুয়েতের শ্রম বিভাগ সর্বসম্মতিক্রমে আগের পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা আগামী ১ জুন ২০২৪ থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী, যেসব প্রতিষ্ঠান শ্রমিক নিয়োগ দিত, তারা যদি বিদেশ থেকে কোনো শ্রমিক আনতে চাইত তাহলে তাদের কুয়েতের মধ্যেই যেসব শ্রমিক রয়েছেন তাদের মধ্যে থেকেই শ্রমিক নেওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল এবং চাহিদার একটি নির্দিষ্ট অংশে শুধুমাত্র নতুন বিদেশি শ্রমিক নিতে পারত। এই পদ্ধতির কারণে দেশটিতে শ্রম ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। যার প্রভাব পড়েছে ভোক্তা পর্যায়েও। গত বছর বেসরকারি খাতে কর্মরত শ্রমিকদের একসঙ্গে দুই চাকরি বা পার্টটাইম চাকরির সুযোগ দেয় কুয়েত সরকার। তবে দুই চাকরি করতে প্রথম ও আসল নিয়োগকর্তার অনুমতির বাধ্যবাধকতা রাখা আছে। পার্টটাইম চাকরিতে দিনে সর্বোচ্চ চার ঘণ্টা কাজ করার সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে নির্মাণখাতে শ্রমিক সংকট থাকায় এ খাতকে এ নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছিল।

অতিরিক্ত তাপে বিশ্বে বছরে ১৯

হাজার শ্রমজীবীর মৃত্যু

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রকাশিত এক বৈশ্বিক প্রতিবেদন

‘এনশিউরিং সেফটি অ্যান্ড হেলথ অ্যাট ওয়ার্ক ইন আ চেঞ্জিং ক্লাইমেট’ (জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা) শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়, অতিরিক্ত তাপের কারণে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১৮ হাজার ৯৭০ জন শ্রমজীবী মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। বিশ্বের সব অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা যাচ্ছে। ৩৪০ কোটি শ্রমশক্তির মধ্যে ২৪০ কোটি মানুষই কোনো না কোনোভাবে অতিরিক্ত তাপের সংস্পর্শে আসছেন। অর্থাৎ, বৈশ্বিক শ্রমশক্তির ৭০ শতাংশের বেশি মানুষ অতিরিক্ত তাপের সংস্পর্শে আসছেন।

অতিরিক্ত তাপ, আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন, চরম আবহাওয়া, কর্মক্ষেত্রে বায়ুদূষণ, পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসবাহিত রোগ এবং অ্যাগ্রোকেমিক্যাল (কৃষি খাতে ব্যবহার করা রাসায়নিক)-এ ছয় ক্ষেত্রে কর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকির তথ্য তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, অতিরিক্ত তাপের পাশাপাশি বন্যা, খরার মতো চরম আবহাওয়ায় বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশে হতাশা, উদ্বেগ, সব বয়সীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা, পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার (পিটিএসডি) বা মানসিক আঘাতজনিত দৃষ্টিভঙ্গি ও মাদকাসক্তি বাড়ছে। দুর্যোগের মধ্যে জরুরি কাজে নিয়োজিত কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, ফায়ার সার্ভিসের কর্মী, জেলে, কৃষি ও নির্মাণশ্রমিকদের মধ্যেও নাজুক মানসিক অবস্থা দেখা যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা যা আছে, তা যথেষ্ট নয়। অনেক দেশ তাপ থেকে সৃষ্ট রোগকে ‘পেশাগত রোগ’ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। ঝুঁকির ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীরা। ঝুঁকি থাকলেও আর্থিক কারণে তাঁরা অতিরিক্ত গরমের মধ্যেও কাজ করেন।

অতিরিক্ত গরমজনিত প্রায় সোয়া দুই কোটি ‘পেশাগত দুর্যটনায়’ ২০ লাখের বেশি মানুষকে নানা প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বাস করতে

হচ্ছে। কৃষি, নির্মাণ, পরিবহন খাতের মতো বাইরে কাজ করা কর্মীরা অতিরিক্ত গরমের কারণে মৃত্যু ও প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে পড়ছেন। তাঁরা হিটস্টেস, হিটস্টোক, হিটক্র্যাম্পস, র‍্যাশ, ত্বকে ক্যানসার, হৃদরোগ, শ্বাসজনিত অসুস্থতা, কিডনির রোগ ও মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছেন। অন্তঃসত্ত্বা নারীরা নানা জটিলতায় পড়ছেন।

প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও নানা কারণে কর্মক্ষেত্রে সংক্রান্ত মৃত্যুর বিষয়ে বলা হয়, বিশ্বজুড়ে ১৬০ কোটি মানুষ আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনের ঝুঁকিতে পড়ে। এ কারণে ত্বকের ক্যানসারে বছরে মৃত্যু হয় ১৮ হাজার ৯৬০ জনের। বাইরে বা রাস্তাঘাটে কাজ করা ১৬০ কোটি মানুষ বায়ুদূষণের শিকার হয়। এর ফলে ৮ লাখ ৬০ হাজার কর্মীর মৃত্যু হয়। ৮৭ কোটির বেশি মানুষ কৃষিকাজ করেন। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন কীটনাশকের সংস্পর্শে আসেন। বছরে ৩ লাখের বেশি কর্মী কীটনাশকের বিষাক্ততার কারণে মারা যান। পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসবাহিত রোগের সংস্পর্শে এসে (ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়ার মতো রোগ সৃষ্টিকারী) বছরে ১৫ হাজার কর্মী মারা যান। চরম আবহাওয়ায় ভূমির পরিবর্তন, খাদ্যসংকট ও বিশুদ্ধ পানির অভাবের মধ্যে কাজের নিশ্চয়তা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে হতাশা শুরু হয়।

প্রথম আলোর এক ই-মেইলের জবাবে আইএলও বাংলাদেশের যোগাযোগ ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ক্যাথেরিন এমজেন্ডি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলেন, অত্যন্ত বিপজ্জনক বায়ুমান ও প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের মধ্যে কর্মীদের যথাযথ সুরক্ষা নেই। বাংলাদেশসহ এশিয়ার অন্যান্য শে এই সময়ে বাইরে যাঁদের কাজ করতে হয়, তাঁরা তাপজনিত অসুস্থতার উচ্চ ঝুঁকিতে আছেন। বাংলাদেশ, ফিলিপাইন, ক্যারিবীয় অঞ্চলে চরম আবহাওয়া দৃষ্টিভঙ্গি, হতাশা ও সব বয়সীদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতার বোঝা বাড়ছে।

তাই অর্থনীতির প্রতিটি খাতে পেশাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত



ঝুঁকি নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সংলাপ আয়োজনসহ কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সমন্বিতভাবে কাজ করা দরকার বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

হয়রানি-নির্যাতন: বিএমইটিতে অভিযোগ করেও প্রতিকার পান না ৬১% প্রবাসী

পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে দেশের বাইরে গিয়ে কর্মস্থলে নানা ধরনের হয়রানি, মানবতের জীবন, এমনকি প্রাণও হারাচ্ছেন প্রবাসী শ্রমিকরা। এসব বিষয়ে ভুক্তভোগী কিংবা দেশে থাকা স্বজনরা প্রতিকার চেয়ে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিনিয়তই অভিযোগ করছেন। বিএমইটির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে হয়রানি-নির্যাতন নিয়ে সংস্থাটির কার্যালয়ে যত অভিযোগ জমা পড়েছে, তার ৬১ শতাংশ প্রবাসীই কোনো প্রতিকার পাননি। ২০২৪ সালে অভিযোগ জমা পড়ে মোট ২ হাজার ৩৮০টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে

৮৬৫টির। সে হিসাবে অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ৩৬ শতাংশ। অর্থাৎ ৬৪ শতাংশ অভিযোগেরই কোনো সুরাহা হয়নি। আর যেসব নিষ্পত্তি হয়েছে তার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় হয় ৪ কোটি ৮৭ লাখ ৯১ হাজার টাকা। এমনকি যারা প্রতিকার পাচ্ছেন, ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার পরিমাণও যৎসামান্য বলে জানান ভুক্তভোগীরা।

প্রবাসীরা বিএমইটিতে প্রধানত চার ধরনের অভিযোগ করেন। এর মধ্যে বিদেশে গিয়ে চাকরি না পাওয়া, আকামা জটিলতা, বেতন ও চুক্তি অনুযায়ী কাজ না পাওয়া। এসব বিষয়ে সরকারের দপ্তরটিতে অভিযোগ জানালে তা তদন্ত ও অনুসন্ধান শেষে নিষ্পত্তি করে বিএমইটি। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেশন মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামর) চেয়ারপারসন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, ‘প্রবাসে হয়রানি-নির্যাতন বন্ধে আগে যেভাবে মনিটরিং করা হতো, এখন ওই কাজগুলো সেভাবে করা হচ্ছে না। ফলে নিষ্পত্তির হার আগের তুলনায় অনেক কমেছে। তবে এটিও ঠিক, যেহেতু

অভিযোগ আগের তুলনায় বেশি আসছে, ফলে নিষ্পত্তির হারটা আনুপাতিক হারে কম হচ্ছে। এ জায়গায় মনিটরিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা হয়নি। এটি করা দরকার ছিল।’

বিএমইটির সংশ্লিষ্টরা জানান, সাধারণ কোনো প্রবাসী সংস্থাটির কাছে হয়রানি কিংবা নির্যাতনের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করলে তা এক মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যদিও অভিযোগ পড়লে সেটি বছরের পর বছর নিষ্পত্তি না হওয়ার অনেক নজির রয়েছে। এমনকি সুরাহা চেয়ে অনেকদিন ধরে সংস্থাটির দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন অনেক ভুক্তভোগী ও তাদের স্বজনরা।

কয়েকটি দেশেই আটকে আছে সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার

সরকারি তথ্যমতে, বিশ্বের ১৬৮টি দেশের মধ্যে ৩১টি দেশে গত পাঁচ বছরে কোনও কর্মী যায়নি। তবে এর মধ্যে মাত্র ৮-১০টি দেশে নিয়মিত কর্মী যায়। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি)

পরিসংখ্যান বলছে, বিদেশে পাঠানো মোট কর্মীর ৯৭ শতাংশ যান মাত্র ১০টি দেশে যায়। গত পাঁচ বছরে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, কাতার, জর্ডান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, ক্রুনাই, মরিশাস এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে কর্মী গেছেন অধিকহারে।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ১৯৭৬ সাল থেকে গত ৪৮ বছরে ১ কোটি ৬০ লাখ ৭৫ হাজারেরও বেশি কর্মীর ক্লিয়ারেন্স ইস্যু করেছে। এর মধ্যে শীর্ষে আছে সৌদি আরব। মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৩৬ শতাংশ গেছে দেশটিতে। কয়েক বছর ধরে এটি আরও বেড়েছে। সর্বশেষ গত পাঁচ বছরের তথ্য বলছে, দেশ ছেড়ে কাজে যাওয়া প্রায় ৫৫ শতাংশ কর্মীর গেছেন সৌদি আরবে।

ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাওয়া অভিবাসীদের ২১% বাংলাদেশি

ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছানো মানুষের সংখ্যার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০২৪ সালের প্রথম চার মাস জানুয়ারি-৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের ১৬ হাজার ২০০ নাগরিক এই পথ দিয়ে ইউরোপে পৌঁছেছেন, এর মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিক ৩ হাজার ৪২৫ জন। এই পথ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যত মানুষ ইউরোপে ঢুকেছে, তার মধ্যে ২১ শতাংশ বাংলাদেশি। ২০২৩ সালে ভূমধ্যসাগর হয়ে অনিয়মিত অভিবাসনের তালিকায় চতুর্থ স্থানে ছিল বাংলাদেশের মানুষ।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রতিবেদন-২০২৪’ এর এক প্রতিবেদনে জানা যায়, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন ও সংঘাতের কারণে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি সংখ্যায় অভিবাসী হয়েছেন। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপুলসংখ্যক মানুষ অভিবাসী হচ্ছেন কি না, সেটা বোঝার জন্য তথ্য-উপাত্ত ও গবেষণার প্রয়োজন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপ পাড়ির প্রবণতা ২০১৫ সাল থেকে বেড়েছে। ২০২৩ সালে ৫ হাজার অভিবাসী মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে ৫২৪ জন মারা গেছেন ভূমধ্যসাগরে, যে রুট (পথ) দিয়ে সাধারণত বাংলাদেশ থেকে লোকজন ইতালিতে যান। ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশি মারা গেছেন ২৮৩ জন (ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপে যাওয়ার পথে)।

বাংলাদেশি অবৈধ অভিবাসীরা ইতালিতে রাজনৈতিক আশ্রয় পাবে না

অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী অভিবাসীদের উৎস দেশগুলো তাদের ফিরে যাওয়ার জন্য কতটুকু নিরাপদ, তা পর্যালোচনার ভিত্তিতে একটি তালিকা করেছে ইতালি সরকার। এ তালিকায় বাংলাদেশসহ ১৭টি দেশকে প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে এসব দেশ থেকে আগত অবৈধ অভিবাসীরা এখন থেকে ইতালিতে রাজনৈতিক বা কোনো ধরনের আশ্রয় পাবেন না বলে ইতালীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্যে জানা যায়।

‘ইতালিতে অবৈধভাবে কোনো দেশের নাগরিক যাতে প্রবেশ না করে, সেজন্য দেশটির সরকার ৪ লাখ ৫২ হাজার অভিবাসী কর্মী নিচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ সাল পর্যন্ত কর্মী নেয়ার এ প্রক্রিয়া চালু থাকবে। যারা দেশটিতে সিজনেল কাজের পাশাপাশি বাসাবাড়ি, ভারী যানবাহনের চালক ও এমনকি বিভিন্ন মানের হোটেলসহ নানা খাতে কাজ করবেন। যেখানে বাংলাদেশিদেরও কাজের সুযোগ রয়েছে। তবে দেশটিতে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়া বাংলাদেশিদের সেখান থেকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া অনেক আগে থেকেই চলমান। ইতালি সরকার এ বিষয় নিয়ে কয়েক বছর ধরে কাজ করছে।’

ওমান ৯৬ হাজার অবৈধ বাংলাদেশি কর্মীকে বৈধতা দেবে

৯৬ হাজার অবৈধ বাংলাদেশি কর্মীকে বৈধতা

দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ওমান সরকার। একইসঙ্গে দেশটি বাংলাদেশ থেকে ১২ ক্যাটাগরিতে লোক নেওয়ারও আশ্বাস দিয়েছে। তবে এই বৈধকরণের জন্য একটি জরিমানা নেওয়া হয়। উক্ত জরিমানা মওকুফ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার থেকে ওমান সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।’

আমিরাতে সাধারণ ক্ষমা কার্যকর: হাজারো অবৈধ বাংলাদেশির সামনে আশার আলো, থাকছে জরিমানা ছাড়া দেশে ফেরার সুযোগ

সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার অবৈধ অভিবাসীদের জন্য ছয় বছর পর পুনরায় সাধারণ ক্ষমার সুযোগ দিয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত দুই মাস এই নিয়ম কার্যকর থাকবে। এ সময়ের মধ্যে দেশটিতে বসবাসরত ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ, অনিয়মিত, কাগজপত্র বিহীন অবৈধ অভিবাসীরা আবেদন সাপেক্ষে বৈধ হতে পারবেন। জেল-জরিমানা ছাড়া দেশে ফিরতে পারবেন আগ্রহীরা। এ ছাড়া ভিজিট ভিসায় আমিরাতে গিয়ে অবৈধ হয়ে যাওয়া প্রবাসীরাও সাধারণ ক্ষমার আওতায় বৈধ হতে পারবেন। দুবাই বাংলাদেশ কনসুলেট থেকে জানানো হয়, সাধারণ ক্ষমার এই সময় প্রবাসীরা যাতে প্রতারিত না হন, সে জন্য সর্বোচ্চ নজরদারি রাখা হচ্ছে। বৈধতা পেতে সরাসরি ইমিগ্রেশনগুলোতে যোগাযোগ করতে হবে। দেশে ফিরতে হলে মিশন থেকে প্রথমে গ্রহণ করতে হবে ট্রাভেল পারমিট। কাউকে দালালের ফাঁদে পা না দেওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি। যেভাবে আউট পাস নিতে হবে- সাধারণ ক্ষমা চলাকালে জেল-জরিমানা ছাড়া দেশে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করে কনসুলেট বা দূতাবাস থেকে অবৈধ অভিবাসীদের ট্রাভেল পারমিট নিতে হবে। ট্রাভেল পারমিট পেলে সংশ্লিষ্ট ইমিগ্রেশন থেকে সংগ্রহ করা যাবে এন্ট্রি পারমিট। এন্ট্রি পারমিট পাওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে ওই অভিবাসীকে দেশে ফিরতে হবে।

আমিরাতে সাজাপ্রাপ্ত ৫৭ বাংলাদেশি ক্ষমা পেলেন

বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে দুবাইয়ে বিক্ষোভ করায় ৫৭ জন বাংলাদেশিকে বিভিন্ন মেয়াদে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আদালত কারাদন্ড প্রদান করে। এসব প্রবাসী শ্রমিককে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস'র অনুরোধে সংযুক্ত আরব আমিরাতে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ক্ষমা করে দিয়েছেন।

বিদেশী কর্মীদের নিরাপত্তায় সৌদি আরবে নতুন বীমা চালু

সৌদি আরবের অর্থনীতির বড় অংশ বিদেশী কর্মী নির্ভর। বিভিন্ন সময়ে এসব কর্মী অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়েন। এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলায় সম্প্রতি সরকারি বীমা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথ ভাবে সৌদি মানবসম্পদ ও সামাজিক উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রণালয় এ উদ্যোগ নিয়েছে। মূলত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন এমন কর্মীরা এ বীমার আওতায় সাহায্য পাবেন। কোম্পানি খেলাপি হয়ে গেলে বা কোনো কারণে নির্দিষ্ট সময়ে বেতন পরিশোধ করতে না পারলে বীমার আওতায় থাকা কর্মীরা সুরক্ষা পাবেন বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। এ প্রকল্পের আওতায় ভ্রমণ টিকিট কিনতে পারবেন বিদেশী কর্মীরা। আর্থিক অনটনের পরিস্থিতিতে কোনো কর্মী যদি দেশে ফিরে যেতে চান, তাহলে সাহায্য করবে বীমা কোম্পানি। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পটি চালু হয়েছে ৬ অক্টোবর।

বিদেশে অসুস্থ হয়ে পড়া নারীদের বেশির ভাগই জরায়ুর সমস্যা ও স্বাস্থ্য সমস্যার ৪৮% মানসিক রোগে ভুগছেন

বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে দেশে ফিরে চিকিৎসা সহায়তার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে আবেদন করেন নারী কর্মীরা। বিগত তিন বছরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ

বোর্ডে চিকিৎসার জন্য অর্থসহায়তা চেয়ে আবেদন করেছেন প্রবাসফেরত ১২৫ নারী শ্রমিক। তাদের মধ্যে ৫০জনই জরায়ুর সমস্যায় আক্রান্ত। কিডনির জটিলতা ও ক্যান্সারে আক্রান্ত যথাক্রমে ১৪ ও ১১ জন। প্রবাসে শারীরিক নির্যাতনে আহত হয়ে চিকিৎসার জন্য অর্থসহায়তা চেয়েছেন ৫০ জন। এ নারীদের সবাই বিদেশ থেকে চিকিৎসাবঞ্চিত অবস্থায় দেশে ফিরেছেন। তাদের মধ্যে ৮৭ জনই ফিরেছেন সৌদি আরব থেকে। বাকিদেরও বেশির ভাগই এসেছেন জর্ডান, ওমান, লেবানন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতে সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। অনেকে দেশে ফেরার পর পরিবারের কাছে নিজের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য শারীরিক নির্যাতনের কথা গোপন রাখেন। নারী শ্রমিকরা জানান, নিয়োগদাতাদের কাছ থেকে তাদের অমানবিক আচরণের শিকার হতে হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়োগদাতারা অতিরিক্ত কাজ করালেও তাদের নিয়মিত খাবার খেতে দিত না। খাবার চাইলে বলত দূরে যা, কাজ কর। তাদের প্রশ্ন, খাবার না পেলে কাজ করব কীভাবে? অসুস্থ হয়ে রুমে পড়ে থাকতাম, ওঠার মতো শক্তি ছিল না যে উঠে পানি খাব। ভাত চাইলেও দেয় না। খাবার খেয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে, সেই খাবার খেয়েছি। শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছি। অসুস্থ হলেও ডাক্তার দেখায়নি। অনেকে নিয়মিত যৌন ও শারীরিক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। নিপীড়ন ও পরিশ্রমে অসুস্থ হলেও চিকিৎসকের কাছে নেয়া হতো না তাদের। এ বিষয়ে গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজের গাইনি বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা বেগম বলেন, মাঝবয়সী নারীদের জরায়ুর সমস্যা হতে পারে। আবার অস্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইলের কারণেও হতে পারে। এছাড়া সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজের কারণেও জরায়ু সমস্যা দেখা দিতে পারে।' সার্বিক বিষয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিদেশ ফেরত যেসব আহত ও অসুস্থ কর্মী আমাদের এখানে অর্থসহায়তার আবেদন করেন, তাদের

সর্বোচ্চ দেড় লাখ টাকা চিকিৎসা সহায়তা দেয়া হয়। আমরা ঘটনাগুলো জানতে পারি দেশে আসার পর। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রবাসীদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে হবে। কতজন নারী কর্মী কোন কোন মালিকের অধীনে কাজ করেন, তাদের সঙ্গে যদি মাসে একবার হলেও যোগাযোগ করা হতো; তাহলে অনেকটাই এসব সমস্যা কমে যাবে। এখানে দূতাবাসের সুপারভিশনের অভাব রয়েছে। কর্মীরা বিদেশে যাওয়ার পর তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ না থাকার জন্য চিকিৎসা বঞ্চিত ও আহত হয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হন।'

তৃণমূল অভিবাসীদের সংগঠন অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম (ওকাপ) পরিচালিত 'বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য: আর্থসামাজিক উন্নয়নে গোপন অভিবাসন খরচের বোঝা' শিরোনামে প্রকাশিত এক জরিপ প্রতিবেদনে জানা যায়, গত কয়েক বছর বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে দেশে ফিরেছেন ১ হাজার ৮৩০ জন প্রবাসী কর্মী। এর মধ্যে ৬০ শতাংশ বা ১ হাজার ৯৬ জন এসেছেন স্বাস্থ্যসেবা নিতে। এর মধ্যে ৪৮ শতাংশ এসেছেন মানসিক সমস্যা নিয়ে। যাঁরা এসেছেন, তাদের মধ্যে ৬১ শতাংশ নারী এবং ৩৯ শতাংশ পুরুষ। মানসিক সমস্যা নিয়ে যাঁরা এসেছেন, তাদের মধ্যে ৫৩ শতাংশ পুরুষ। নারী বেশি এলেও তাঁদের চেয়ে পুরুষ কর্মীরা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে বেশি এসেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি দেশ থেকে ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মার্চ থেকে জুন এর মধ্যে দেশে ফিরে আসা (কুমিল্লা, ঢাকা, ফরিদপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ) ১ হাজার ৯৬ জন বিদেশফেরত কর্মীর ওপর একটি জরিপের মাধ্যমে এ তথ্য পাওয়া যায়। যেসব স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে প্রবাসীরা ফিরে এসেছেন, তার মধ্যে আছে পিঠে ব্যথা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আঘাত, হৃদরোগ, কিডনি সমস্যা, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, টিউমার, ত্বকের রোগ। আর

মানসিক সমস্যার অভিযোগ করেছেন বেশি গৃহকর্মী। এরপর আছে কৃষি, নির্মাণ অবকাঠামো, পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা।

গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে ওকাপের চেয়ারপারসন শাকিরুল ইসলাম বলেন, একজন কর্মীও যদি স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে দেশে ফেরত আসেন, তার মানে তাঁদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মানসিক সমস্যায় নারীদের নানা সেবা দেওয়া হলেও পুরুষদের বিষয়টা উপেক্ষিত থাকে। অথচ এ গবেষণা বলছে, পুরুষের মানসিক সমস্যা বেশি।

বিদেশে কর্মী যাওয়া কমেছে ২৪%, কাজ না পেয়ে দেশে ফেরা প্রবাসীর সংখ্যা বাড়ছে

২০২৪ সালে বাংলাদেশিদের জন্য নতুন শ্রমবাজার উন্মুক্ত হয়নি। মালয়েশিয়া, ওমান, মালদ্বীপের মতো পুরোনো শ্রমবাজার বন্ধ হয়েছে। আগস্ট ২০২৪ থেকে অঘোষিতভাবে বন্ধ সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রমবাজার। যুক্তরাজ্য, ইতালি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উন্নত দেশেও কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়েছে। জনশক্তি রপ্তানি অর্ধেক নেমেছে ব্রুনাইয়ে। মরিশাসে বন্ধ রয়েছে ঘোষণা ছাড়াই। ২০২৩ সালে চাকরি নিয়ে ১৩ লাখ ৭ হাজার ৮৯০ জন বিদেশ গিয়েছেন। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ সংখ্যা ৯ লাখ ৭১ হাজার ৪৪১ জন। তাদের মধ্যে সৌদি আরব গেছেন ৫ লাখ ৭৯ হাজার ৪২৩ জন, যা মোট জনশক্তি রপ্তানির ৬০ শতাংশ। যা ২০২৩ সালের তুলনায় ২৫.৫৯ শতাংশ কম।

এ বিষয়ে বেসরকারি সংস্থা অভিবাসী উন্নয়ন কর্মসূচির (ওকাপ) নির্বাহী পরিচালক শাকিরুল ইসলাম বলেন, দক্ষ কর্মী না থাকায় বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান সৌদি আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশনির্ভর। এসব দেশে ভিসা কেনাবেচা, প্রতারণা, নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের কয়েক গুণ টাকা আদায়সহ নানা অনিয়ম হয়। দক্ষ কর্মী তৈরি ছাড়া

কর্মসংস্থান বাড়বে না। নতুন শ্রমবাজার তৈরিতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। জনশক্তি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বায়রার নেতা ফখরুল ইসলাম বলেন, আর্থিক সংকটে সব দেশেই কর্মসংস্থান কমছে। ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি নিয়ে নতুন শ্রমবাজার খুঁজছেন না।

২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত আউট পাস নিয়ে দেশে ফেরত এসেছেন ৪০ হাজার ৩০৫ কর্মী। বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়া, চিকিৎসা বর্ধিত ও প্রতারণার শিকার হয়ে বিভিন্ন দেশে কর্মী হিসেবে যাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে দেশে ফিরেছেন ১ হাজার ৯২৬ জন। এদিকে মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগের তথ্যমতে, কাজ না থাকায় দেশে ফিরতে নিবন্ধন করেছেন ৩১ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশী। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্যমতে, গত ১৯ মাসে বিভিন্ন দেশে গিয়ে ছয় মাসের মধ্যেই দেশে ফিরেছেন এমন কর্মীর সংখ্যা ১ হাজার ৯২৬। এর মধ্যে সৌদি আরব ফেরত ৭৭৬, মালয়েশিয়া ২২১, ওমান ২১৬, দুবাই ১২২, রোমানিয়া ৮৭, কাতার ১২২, আরব আমিরাত ৬৭, কুয়েত ৭৪, কিরগিজস্তান ৫২, উজবেকিস্তান ৪৩, কাজাখস্তান ২৮ ও সিঙ্গাপুর ফেরত ৮৭ জন। তারা সবাই ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে বীমা সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। তবে যারা আবেদন করেননি তাদের সংখ্যাটা আরো অনেক বেশি হবে। জনশক্তি রফতানি সংশ্লিষ্টরা ফেরত আসার অনেকগুলো কারণ রয়েছে বলে মনে করেন। তাদের মতে- বিদেশে গিয়ে পছন্দমতো কাজ না পাওয়া। অনেক কোম্পানি এক কাজের কথা বলে অন্য একটা দেয়া। আকামার সমস্যাও রয়েছে, বিশেষ করে সৌদি আরবে। মূলত এ ইস্যুগুলোর কারণে কর্মীরা বেশি ফেরত আসছেন। এ সমস্যাগুলো সমাধান করতে হলে একেক দেশের জন্য একেক নীতি গ্রহণ করা জরুরি বলে জানান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘সমস্যাগুলো সমাধানের পদক্ষেপ

সরকারকেই নিতে হবে এর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। এখানে দূতাবাসের বড় ধরনের ব্যর্থতা রয়েছে। কেননা দূতাবাস থেকে সত্যায়নের মাধ্যমে কোম্পানিতে কর্মী পাঠানো হয়। ফলে কর্মী যখন কাজ পাচ্ছেন না, তখন দূতাবাসের যাচাই-বাছাই ঠিকমতো ছিল কিনা তা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। অনেক সময় কাজ না থাকলেও বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়ে যান কফিলরা।

ইউরোপে কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপে ভোগেন অর্ধেক কর্মী

বৈশ্বিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ম্যানপাওয়ার গ্রুপ গ্লোবাল ইনসাইটস এর এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ইউরোপের ১০টি দেশের ৪৮ শতাংশ কর্মী কর্মক্ষেত্রে দৈনন্দিন মানসিক চাপে ভোগেন, যদিও দেশভেদে মানসিক চাপের মাত্রা ভিন্ন। ইউরোপের চারটি দেশে অর্ধেকের বেশি কর্মী মানসিক চাপে ভুগছেন। স্পেনে সর্বোচ্চ হার ৫৮ শতাংশ, সুইডেন ও ইতালিতে ৫৩ শতাংশ ও পোল্যান্ডে ৫১ শতাংশ। অর্ধেক কর্মী কর্মক্ষেত্রে দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কিত মানসিক চাপ অনুভব করেন। এক-তৃতীয়াংশ মনে করেন যে, ক্যারিয়ারের লক্ষ্যে পৌঁছানোর যথেষ্ট সুযোগ নেই তাদের।

জরিপে অংশগ্রহণকারী এক-তৃতীয়াংশ অংশগ্রহণকারী ছয় মাসের মধ্যে চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন। কর্মীদের ৫৮ শতাংশ প্রয়োজন অনুসারে চাকরি খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী বলেও উল্লেখ করেন।

তুলনামূলকভাবে নেদারল্যান্ডসের ৩৪ শতাংশ বা কম সংখ্যক কর্মী মানসিক চাপের কথা বলেছেন। এর পরের দুটি অবস্থানে রয়েছে নরওয়ে ৪০ শতাংশ ও সুইজারল্যান্ড ৪৬ শতাংশ। যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও ফ্রান্সের কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ ইউরোপের গড় ৪৮ শতাংশের সমান। কর্মক্ষেত্রে অনেক কর্মী যথেষ্ট চাপ অনুভব করলেও ৬৫ শতাংশ কর্মী বিশ্বাস করেন, তাদের কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পর্যাপ্ত সহযোগিতা

দিয়ে থাকেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অফিস।

এ ধরনের উত্তরদাতা সবচেয়ে কম ছিল ফ্রান্সে, সেখানে ৫৯ শতাংশ কর্মী কর্মক্ষেত্রে সহায়তার কথা জানিয়েছেন।

জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের ৬০ শতাংশ কর্মীও একই উত্তর দিয়েছেন। তবে ব্যক্তি ও কর্মজীবনে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন ও অফিসের সাহায্য বেশি পাওয়া যায় নেদারল্যান্ডসে। জরিপে অংশ নেয়া ৭৩ শতাংশ ডাচ কর্মী এ তথ্য দিয়েছেন। নিজেদের কাজ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে জরিপে অংশ নেয়া বেশির ভাগ কর্মীর। ইউরোপের ৮২ শতাংশ কর্মী বিশ্বাস করেন যে, তাদের কাজ অর্থবহ এবং এর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। ইতালিতে এ হার সবচেয়ে কম, ৭৫ শতাংশ। জার্মানি ও পোল্যান্ডে এ ধরনের ইতিবাচক মনোভাব সবচেয়ে বেশি, ৮৭ শতাংশ।

মোঃ আবু নাছের (মাসুদ)
উর্ধ্বতন কর্মসূচি কর্মকর্তা
নাগরিক উদ্যোগ
anasher75@yahoo.com

তথ্যসূত্র:

- যায়যায়দিন- ৮ মে, আজকের পত্রিকা- ১ মে ২০২৪
- বাংলা ট্রিবিউন ১৮ জানুয়ারি, ২৮ মার্চ, ০১ এপ্রিল, ২৪ এপ্রিল, ২৮ এপ্রিল, ২০ মে, ১২ জুন, ১৯ অক্টোবর, ১৫ ডিসেম্বর ও ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪
- কালের কণ্ঠ-২৩ এপ্রিল, ০১ মে, ৫ মে, ৮ মে, ১২ জুন, ৯ ডিসেম্বর, ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪
- বণিক বার্তা-২৫ জানুয়ারি, ২০ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ২৫ এপ্রিল, ০৩, ০৫ ও ১২ মে, ০১ জুন, ২২ সেপ্টেম্বর, ৮ অক্টোবর, ৯, ১০, ১২ ও ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪
- দেশ রূপান্তর- ১১ জানুয়ারি, ৪, ৭, ১৫, ২২ ও ২৭ মার্চ, ০৭ ও ১৯ এপ্রিল, ০১ মে, ৫ অক্টোবর ২০২৪
- সমকাল- ২৪ মার্চ, ৯, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮, ১৯ ও ২০ নভেম্বর, ২০২৪
- ঢাকা টাইমস- ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ইত্তেফাক-২৪ ফেব্রুয়ারি, ৩০ সেপ্টেম্বর, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪
- প্রথম আলো- ২০ জানুয়ারি, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৬ অক্টোবর, ২৫ অক্টোবর ২০২৪
- যুগান্তর- ০৬ মে, ২৫ জুলাই ২০২৪
- সময়ের আলো ২০-২১ মে ও বিজনেস আওয়ার ২১ মে ২০২৪, সিক্সসিটি নিউজ ২৮ অক্টোবর ২০২৪
- জনকণ্ঠ ১৪ জুন ২০২৪
- <https://www.dw.com/bn/>, অক্টোবর ২০২৪
- <https://www.somoynews.tv/news/2024-12-02>